পিতা ইব্রাহিম (আ.)

বুলবুল আজাদ

ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মমত। তিনিই প্রথম তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম।

সূরা হজ্জ্ব।

হে আমাদের প্রতিপালক
তুমি আমাদের এই নিবেদন কবুল করে নাও
তুমিই সবকিছু জানো এবং শোনো।

পিতা ইব্রাহিম আঃ

বুলবুল আজাদ

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

wcZv Bewng Avt

ejej AvRv`

cKvkKvj

PZ_ ms¯‹iY

†m‡Þ¤i 2009 mvj

cKvkK

nwKgvev` LvbKv‡q †gvRv‡Ïw`qv

fBMo, bvivqYMÄ

†hvMv‡hvM 01726288280, 01190747407

c"Q`

Ae`i †ivDd miKvi

g`K

kIKZ wcÈvm

190/we, dwK‡iicj,XvKv-1000

†gvevBj 01711-264887

01715-302731

wewbgq

cÂvk UvKv

PITA IBRAHIM : Biography of the great Prophet Hazrat Ibrahim (As) by Bulbul Azad and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Printed by Shawkat Printers, 190/B Fakirapool, Dhaka-1000, Cover Designer Abdur Rouf Sarker

---

Exchange Tk. 50/- U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0040-8

بسم الله الرحمن الرحيم

হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী দেখেছিলো ইমানের সেই বসন্তোৎসব। বিশ্বাসের বাগান ভরে গিয়েছিলো ফুলে, ফলে, সৌন্দর্যের অনন্ত সৌরভে। কুফরি ও শিরিকের অন্ধকারে নিমজ্জিত অত্যাচারী নমরূদের রাজত্বে এসেছিলো ইমানের দিগন্তবিস্তারী উপপ্লব। আগুনের লেলিহান শিখা নিভে গিয়েছিলো বুকভরা বিশ্বাসের প্রচণ্ড প্রতাপে। সেই চিরবিজয়ী চিরবিপ্লবী ব্যক্তিত্বের নাম হজরত ইব্রাহিম আ.।

তিনিই আমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান। মুসলমান জাতির পিতা তিনি। আল্লাহ্‌পাক একথা এরশাদ করেছেন এভাবে— ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ। তিনিই প্রথমে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান।

সমস্ত নবীগণের ইমাম আমাদের প্রিয়তম নবী হজরত মোহাম্মদ স. এর উম্মত আমরা। আমাদের শরীয়তের অধিকাংশ বিধান হজরত ইব্রাহিম আ. এর শরীয়ত থেকে নেয়া হয়েছে। হজ্ব এবং কোরবানীর মতো এরকম অনেক বিধানের মাধ্যমে আজও আমরা বহন করে চলেছি আমাদের জাতির পিতার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। মহাবিপ্লবী পিতা ইব্রাহিম ছিলেন আল্লাহ্‌র খলিল (বন্ধু)। এই বিশাল মর্যাদা লাভের মূলে তাঁর প্রধানতম আমল ছিলো— আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে শত্রুতা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় বান্দা হতে গেলে এই আমলেই আমাদের সমর্পিতপ্রাণ হতে হবে। হয়ে উঠতে হবে বিদ্রোহী আল্লাহ্‌পাকের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে।

আমরা একথা তো জেনেই নিয়েছি যে, আমাদেরই প্রবৃত্তি (নফছ) এবং অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহ্‌র পথের প্রধানতম দুশমন। আর এই দুশমনদের প্রতিহত করে ইমানী বিজয় ছিনিয়ে আনতে গেলে আমাদের বাইরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বন্দী করতে হবে শরীয়তের বন্ধনে। একই সঙ্গে অন্তরকে করতে হবে শয়তানের অধিকার থেকে চিরমুক্ত। তবেই আমরা হয়ে উঠতে পারবো আল্লাহ্‌র পথের সফল মুজাহিদ।

আল্লাহ্‌পাক কি একথা জানাননি, ‘শয়তান তোমাদের নিশ্চিত শত্রু’। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ স. কি এ কথা বলে দেননি যে, শয়তানের অধিবাস প্রত্যেক মানুষের অন্তরে (কলবে)। আর তাকে বিতাড়িত করতে হলে জিকিরময় কলবের অধিকারী হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আর কলবের এই অবস্থা অর্জিত হতে পারে তখনই, যখন কোনো তরিকায় খাঁটি পীর মোর্শেদের কাছে বায়াত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করা যায়।

শয়তানকে অন্তরে রেখে আমাদের দ্বীন দুনিয়া কোনো কিছুই বিশুদ্ধ হতে পারে না। একথা নিশ্চিত যে, যারা দ্বীনের এই মর্মকথা বুঝতে সক্ষম হননি, নিঃসন্দেহে তারা তাদের মেধা মনন বিশ্বাস ধারণা প্রতিভা শক্তি সাহস— সবকিছু শয়তানের কাছে সোপর্দ করে দিয়ে বসে আছেন। এভাবেই লক্ষ কোটি মানুষকে শয়তান তার অনুসারী বানিয়ে নিয়েছে এবং বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শাশ্বত দ্বীন ইসলামের সুবাসিত কানন থেকে অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে যোজন যোজন দূরত্বে সরিয়ে রেখেই ক্ষান্ত হয়নি শয়তান, মুসলমান নামধারীদের মধ্যেও সে যুগে যুগে বিস্তার ঘটিয়েছে বিভিন্নমুখী ফেতনার। এভাবেই সে সৃষ্টি করেছে শিয়া, কাদিয়ানি, মওদুদী মতবাদের মতো পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর।

আমরা বার বার বলছি। এবারও বলছি। এলেম, আমল ও এখলাসের সমন্বয়েই শরীয়ত। এখলাস অর্জনের জন্যই তরিকা এবং সাফল্যের সবচেয়ে সহজ সোপান হচ্ছে, তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়া। এই তরিকায় অতি সহজে আল্লাহ্‌তায়ালার জিকিরে কলব জিন্দা হয় বলে শয়তান কলবে তার অবস্থান গড়তে সক্ষম হয় না। এভাবেই এই তরিকায় শুরু হয় শত্রু শয়তানের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ।

সকল মানুষের প্রতি আহবান আমাদের। আসুন, বিশ্বাসের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস মেনে নিয়ে শরীয়তের পুরোপুরি পাবন্দ হয়ে যাই আমরা। গ্রহণ করি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সবচেয়ে সহজ সুন্দর তরিকা— তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়া।

আর এই মহান আন্দোলনে আমাদের একমাত্র নীতি হোক— আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে শত্রুতা।

ওয়াস্‌সালামো আউয়ালাঁও ওয়া আখেরান।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

পৃথিবী জ্বলছে। অবিশ্বাস, অপ্রেম আর অমানবতার সর্বনাশা আগুনে। এ আগুন নেভাতেই হবে। নাহলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমাদের এই সাধের প্রবাস। যেখানে নেই স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা, নেই মানবপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম– সেখানে কী হতে পারে আর? দ্বীন? দুনিয়া?

অসহায় মানবতা। তুমিতো দলিত। নিস্পেষিত। রক্তিত। বাঁচবার পথ কি জানো না? শোনোনি আল্লাহ্পাকের অমোঘ বাণী– 'অমা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতুল্লিল আলামিন' (বিশ্বসমূহের প্রতি তোমাকে রহমতরূপে নির্বাচন করা হয়েছে)। সেই রহমতের নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর পথে সমর্পিত হও। যদি বাঁচতে চাও। বিকশিত হতে চাও।

নবী রসুলগণই মানবতার প্রকৃত আপনজন। দয়ার্দ্র চিকিৎসক। প্রেমময় শুশ্রূষাকারী। তাঁদের সম্পর্কে উদাসীন হে মূঢ় মানবতা– জানো না, অন্তরে আল্লাহ্প্রেমের অনির্বাণ আগুন যারা বুকে ধরে রাখেন সেই নবী ইব্রাহীম আ. এর মতো মহান মানুষগণের পায়ের নিচে বার বার নিভে গিয়েছে অবিশ্বাসী নমরুদ সম্প্রদায়ের লেলিহান অগ্নিকুণ্ড। প্রেমের পথই মুক্তির পথ। সমর্পণের পথই শান্তির পথ। এসো। অন্তর পোড়াই। জ্বলি। জ্বালাই সবাইকে। শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর প্রকৃত প্রতিনিধি কোনো কামেল মোকাম্মেল মোর্শেদের তত্ত্ববধানে শুরু করি আল্লাহ্-স্মরণের, আল্লাহ্-প্রেমের আগুন প্রজ্জ্বলনের কাজ। মানবতার উত্থান, বিকাশ ও সফলতা এই পথেই।

কেনো তবে তোমরা আজ প্রতিপক্ষে অবস্থান নিয়েছো হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়? আর কেনো তবে তোমরা বিকৃত বিশ্বাসের প্রতিভু হয়ে দাঁড়িয়েছো হে কাদিয়ানি, শিয়া ও মওদুদী জামাত। কবে সতর্ক হবে? কবে বুঝবে? তোমরা পথচ্যুত। বিপথের পথিক।

আলহামদুলিল্লাহ্। প্রেমের ও বিপ্লবের নবী, নবী রাসুলগণের পিতা, মানব কল্যাণের জন্য নির্বাচিত মুসলমানদের (খইরা উম্মাতিন) জাতির পিতা– পিতা ইব্রাহিম এর পবিত্র জীবনকথা দ্বিতীয় বারের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। সকল দরূদ ও সালাম মহানবী মোহাম্মদ স. এর প্রতি, পিতা ইব্রাহিম আ. সহ সকল নবী রসুলগণের প্রতি, সাহাবায়ে কেরাম রা., আহলে বায়েত এবং আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি। নতুন নতুন শব্দে ও বাণীতে হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া প্রকাশনের প্রজ্ঞা ও প্রেমস্রোত বহাল থাকুক। আল্লাহুম্মা আমিন।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

Avgv‡`i cKvwkZ eB

Zvdmx‡i gvhnvix (1Ñ12) †gvU 12 LÊ
gv`v‡iRb beIqvZ (1-8) †gvU 8 LÊ
gvKvgv‡Z gvhnvix
gKvwkdv‡Z Avqvbqv • gvAvÕwi‡d jv`wbqv
gve`v Iqv gvÔAv`

gKZev‡Z gvmgxqv (1-3) †gvU 3 LÊ
bKkv‡q bKke›` • †Piv‡M wPkZx • evqvbj evKx
Rxjvb m‡hi nvZQwb • b‡i †miwn›` • Kwjqv‡ii KZe • c_g cwievi
gnv‡cwgK gmv • Zwg‡Zv †gv‡k` gnvb • bexbw›`bx

Avevi Avm‡eb wZwb
m›`i BwZeË • †dvwiv‡Zi Zxi • gnv cve‡bi Kwnbx
Kx n‡qwQ‡jv Aeva¨‡`i

THE PATH
c_ cwiwPwZ • bvgv‡Ri wbqg • igRvb gvm • Bmjvgx wekvm
BASICS IN ISLAM • gvjveÏv wgbû

†mvbvi wkKj
wekv‡mi ewówPý • mxgvšcnix me m‡i hvI
ZwIZ wZw_i AwZw_ • †f‡O c‡o evZv‡mi wmwo
bx‡o Zvi bxj †XD • axi mi wejw¤Z e¨_v

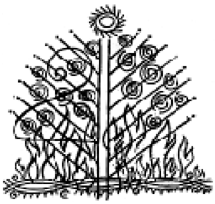

এক

হলুদ গোল চাঁদ উঠেছিলো আকাশে।

পূর্ণ কলা চাঁদ।

তিনি গুহার ভেতর থেকে গুটি গুটি পায়ে বাইরে এলেন। এসে পুব আকাশে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন।

আকাশের গায়ে তখন অজস্র চুমকি দেয়া আলোর মিছিল। নীলের জমিনে অসংখ্য আলোকমালার রহস্যময় বিস্তার, যেনো পদ্মসরোবরে ফুটে আছে রাশি রাশি শাদা ফুল। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে এই মুহূর্তে আকাশের কোণ ফুঁড়ে ঐ যে উঠে এলো সুন্দর উজ্জ্বল ও অপার রহস্যময় আলোক পিণ্ড; এটা কি?

নির্জন রাতের মৌনতা, দূরে দূরে গিরি উপত্যাকার ধুসর প্রান্তর, দূর দিগন্তে ঝিকিয়ে উঠা মায়া মরীচিকা– সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে তাঁর মনে এখন অপূর্ণ বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার জন্ম দিলো–।

এই কি আমার প্রভু? হঠাৎ করে কথাটা ভাবলেন তিনি।

এর আগে আকাশের একটি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ নক্ষত্রকে দেখে তিনি এরকমটা ভেবেছিলেন– হা'জা রাব্বী? কিন্তু না, পূর্বের বিস্ময় কেটে গেছে কোমলস্পর্শ মোহনীয় এই আলোক পিণ্ডটি দেখে।

ক্রমেই নিসর্গ চরাচর মোহনীয় হয়ে উঠছে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির অস্তিত্ব যেনো ক্ষয়ে গেলো। তাহলে ঐ প্রাণবন্ত আলোকপিণ্ডটি নিশ্চয় আমার রব? কথাটা আবারো ভাবলেন তিনি।

রাত্রি প্রায় অবসান।

আকাশের হলুদ চাঁদটি এখন ক্রমশঃ পাণ্ডুর হয়ে এলো। পাণ্ডুর থেকে ম্লান। এক সময় সেই ম্লান পিণ্ডটি থর থর কম্পিত মনে হলো, যেনো কার আগমনী সংবাদে কিংবা আগমন আভাসে ভীত সন্ত্রস্ত এখন সে। এরপর কম্পিত অবয়ব নিয়েই সেটি হঠাৎ করে পালিয়ে গেলো?

আহা! এখন তো সেই মোহনীয় কোমলস্পর্শ আলো নেই। উজ্জ্বল নক্ষত্রটিও এরকমভাবে হারিয়ে গিয়েছিলো এক সময়। এমন তো আমি চাইনি।

এখন পুব আকাশে অন্যরকম আলোর আভাস। এ যেনো জ্যোতির্ময় আলোকলতা। আলো আঁধারের অদ্ভুত লুকোচুরি? এও-তো আরেক রক্তাক্ত অগ্নিপিণ্ড।

কিন্তু একি! রক্তাক্ত আবরণে কে এলো ঐ?

ওই- তো আরেক রক্তাক্ত অগ্নিপিণ্ড।

আকাশের কোণ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো আরো সহস্রগুণ তীব্র আলোক নিয়ে।

ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছে তার রশ্মিচ্ছটা। যতই সময় যাচ্ছে ততই যেনো প্রচণ্ডতা বাড়ছেই। সৌরজগতে এর চেয়ে অধিক বিশাল আর দীপ্তিমান কোনটি তো নয়। তাহলে? এই বুঝি আমার বর? কথাটা নতুন করে ভাবলেন তিনি।

কিন্তু না, অপরাহ্ন নামতেই সেই আলোর তীব্রতা মিইয়ে এলো। অগ্নিক্ষরা লূ-হাওয়ার দাপট ক্ষীণ হলো। যেনো ক্রমশঃ ম্লান-পাণ্ডুর হচ্ছে এটিও।

এটিও তবে আত্মগোপন করবে? হ্যাঁ, তাই। দিন শেষে সূর্য ডুবে গেলো। আঁধারে গ্রাস করলো চরাচর। তিনি সবকিছুই দেখলেন। দেখে বুঝে, নিজেকে শুধিয়ে তিনি বলে উঠলেন– না, না, আমি আত্মগোপনকারীকে কখনো পছন্দ করি না।

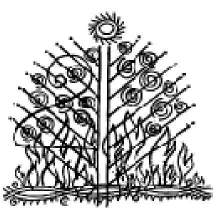

দুই

শিশু-মাতা, শিশুকে শেখালেন– ঐগুলো নক্ষত্র, ঐ যে চাঁদ এবং এইতো দিনের সূর্য....।

এবার শিশুটি তাঁর পিতার আশ্রয়ে ফিরে এসেছেন। এতদিন তিনি ছিলেন গুহাবাসী। গুহা এবং গুহার বাইরের চিত্র, প্রকৃতি শিশু বয়েস থেকেই শিশুকে সত্যের দিকে যেনো হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। নিঃসর্গের ধ্যানগম্ভীর মৌনতা, নভোমণ্ডলের আলোকরহস্য, মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা দিনের বিস্ময়– যেনো নীরবে অনেক অনেক পাঠ মুখস্ত করিয়েছে তাঁকে। শিশু বয়েস থেকেই তিনি যেনো নিঃসর্গের বিদগ্ধ পাঠক। অন্তরের মর্মমূল থেকে কে যেনো তাঁকে অহরহই ডেকে যায়–সীমা নয়–সীমা নয়– আমি তো অসীম.....

শিশু এক্ষণে বালক।

শুধু জীবন নয়– জীবনের উৎসমূলকে জানার অসহ্য তৃষ্ণা তাঁর। কিন্তু এই বালক পিতার আশ্রয়ে এসেই দিনের পর দিন দেখলেন জীবনের অন্যরূপ। এ যে তাঁর ভাবনার বিপরীত। মন তাঁর বিদ্রোহী হয়ে উঠলো পরিবারের, সমাজের প্রতি। আপনজনদের, সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা, জীবনচরণে তিনি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত।

একদিন তিনি পিতা আজরকে প্রতিমা দেখিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন?

পিতা দ্বিধাহীন ভাবে জবাব দিলো, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে আমিতো আপনার সম্প্রদায়কে ভ্রান্তিতে বিদ্যমান দেখছি।

–তার মানে? কি বলতে চাও ইব্রাহিম? পিতা ক্ষুব্ধ।

–এতো নিজের হাতে গড়া মূর্তি। এর উপাসনা ত্যাগ করুন পিতা। সবকিছুর স্রষ্টা যিনি, দৃঢ়ভাবে সেই এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করুন, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি এবং সৌভাগ্য লাভ করতে পারবেন....

–খামোশ। এটা আমার পিতা, পিতামহের পথ, এ কথা ভুলে যেওনা ইব্রাহিম।

–কিন্তু পিতা। এটা যে নিখাদ পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। সরল ও সত্য পথ হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস এবং এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। তিনি সমস্ত কিছুর একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই উপাস্য। অন্য কেউ নয়।

–তর্ক করোনা ইব্রাহিম। পিতা আজর রূঢ়ভাবে বললেন– দেশাচারকে মানতে শেখো। আমাদের মা'বুদ বাদশাহ নমরুদ; তাকেও মানতে শেখো।

–না। ঐভাবে– না।

–না কেনো বলছো ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম বললেন, হে আমার পিতা! আপনারা যাকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করেন, তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। সমস্ত কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে আমি একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে আসমান ও জমিনের রবের দিকে মুখ ফিরালাম, আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূত নই–।

স্পষ্টতঃ দ্বন্দ্বের এখান থেকেই শুরু।

তবুও ইব্রাহিম আ. সবিনয়ে বললেন আবার, হে আমার পিতা। আমার নিকটে তো এসেছে জ্ঞান, যা আপনার নিকটে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমিই আপনাকে পথ দেখাবো। হে আমার পিতা ! শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো প্রভুর অবাধ্য, প্রকাশ্য শত্রু.....।

ক্রুদ্ধ পিতা আজর বললো– তুমি যদি দেবদেবীর সম্মন্ধে নিবৃত না হও তাহলে প্রস্তরাঘাতে প্রাণনাশ করবো তোমার......।

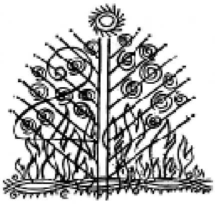

তিন

সময় বয়ে যায়।

একদিকে সৃষ্টির অপার রহস্যময়তা, অন্যদিকে দুনিয়া ভেসে যাচ্ছে শিরকের-কুফরের অন্ধকার স্রোতে। তিনি, হজরত ইব্রাহিম মনে মনে শঙ্কিত হলেন এ স্রোতের ভয়াবহতা দেখে।

শুধু আরব বিশ্ব কেনো?

তামাম বিশ্বের মানুষ অজ্ঞতায়–মূর্খতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলো। পৌত্তলিকতায় ডুবে ছিলো।

কথিত আছে হজরত নূহ আ. এর আওলাদেরা আরব দেশে এসে বসবাস শুরু করেছিলো। তারা নূহ আ. এর প্রদর্শিত পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিলো। ফলে কাফের হয়ে জীবন যাপন করছিলো তারা। শিরক আর কুফরী আকীদায় তাদের জীবনে বার বার এসে পড়ছিলো আযাব এবং গযব।

কোনো কোনো গোত্র ফেরেশতাদের 'প্রচণ্ড হাঁকে' সাবাড় হয়ে যাচ্ছিলো। আরো নানাপ্রকার আযাবে আক্রান্ত হচ্ছিল তারা। তবু তারা কোনো নবীর, কোনো রসূলের সত্যের আহবানে সাড়া না দিয়ে পাপ-পঙ্কিল জীবনযাপনে কাল কাটাচ্ছিলো।

ঐ যুগে ইরাকের বাদশাহ্ ছিলো নমরুদ। সে শুধু জনতার বাদশাহ্ হিসেবে নিজেকে দাবী করতো না। তার চেয়েও মারাত্মক কিছু আকাঙ্খা করতো।

নমরুদের অজস্র সৈন্য-সেনা।

শক্তি সামর্থ্যে, অহংকার–গর্বে ভেকের মতো সর্বদা স্ফীত থাকতো সে।

দেশের প্রজারাও দেবতাদের চেয়ে নমরুদকে অধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভয় করতো। কেননা নমরুদ ছিলো তাদের কাছে ভীতিকর খোদা।

নমরুদও নিজেকে অসীম ক্ষমতাধর ভাবতো। অঢেল লোক লস্কর, প্রাচুর্য পরাক্রমতার। শানদার তখতে-তাউসে বসে অভিনব চিন্তা-ভাবনায় সর্বদা মশগুল থেকে সময় হরণ করতো সে। শুধু যে চিন্তা–ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়, –কার্যতঃ শক্তির মদমত্ততাও দেখাতো সে।

নমরুদ ছিলো যুদ্ধ প্রিয়। পররাজ্য লোভী।

যুদ্ধ করেই শামদেশ, হিন্দুস্থান, মিশর, রোম, তুরস্ক, আরব, আজম, পূর্ব ও পশ্চিমে বহু দেশ তার করদ রাজ্যে পরিণত করে ফেলেছিলো।

বাবেল শহরে তার শাহানা মহল।

এই শাহানা সিংহাসনে বসেই আকাশচুম্বী আকাঙ্খা তার বৃদ্ধিই পাচ্ছিলো। আকাঙ্খা, লোভ আর অহংকার অচিরেই তাকে গ্রাস করলো। পৃথিবীর সমসায়িক নৃপতিগণ তখন তারই বশংবদ।

দম্ভ, শক্তি, তোষামোদী ও রাজসিংহাসনের একচ্ছত্র স্পর্শ পেয়ে নমরুদ অন্য কোন খোদা মানতে রাজী নয় আর.....

কিন্তু তার দাম্ভিক জাঁকজমকের সেই মুহূর্তে একদিন সে আকস্মিকভাবে শুনতে পেলো এক নতুন কথা, কে যেনো আসছেন। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সত্যকে নিয়ে কে আসছেন?

তিনি তো এসেছেন।

ধীরে ধীরে বেড়েও উঠছেন স্রষ্টার অপার রহস্যময়তায়। আড়ালে-অন্তরীক্ষে। প্রথমে আপন ঘরে, পরে আপন সম্প্রদায়কে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সত্যকে শোনাচ্ছেনও...

তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে?

তারা বলতে লাগলো– আমরা এ সমস্ত বিতর্কে যেতে চাই না।

– কেন চাওনা?

– কারণ আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এরকমই করে এসেছে, অতএব আমরাও তাই করছি–

– কিন্তু তোমাদের প্রতিমা কি কোনো উপকার, কিংবা অপকার করতে পারে?

– না।

– তাহলে?

– তুমি তো জানো ইব্রাহিম– তারা কথা বলতে অক্ষম।

– জানি। এবং জানি বলেই তোমাদেরকে জানাচ্ছি– এরা কাঠ, মাটি ও পাথরের তৈরী মাত্র। এরা একাধারে মুক, বধির, অন্ধ এবং নিস্প্রাণ। কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই এদের। সুতরাং হে আমার কওম। তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার শরীক করছো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

কওমের লোকেরা বললো– ওহে ইব্রাহিম! তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? আমাদের প্রাচীন বিশ্বাসকে ভাঙতে তুমি তো দারুন দুঃসাহস দেখাচ্ছো। নিশ্চয় তুমি দেবতাদের কোপানলে পতিত হবে।

হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর কোনোই পরোয়া করি না। যেহেতু আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। বরং তোমরাই পথভ্রষ্ট।

এইভাবেই কওমের বিরুদ্ধে তার প্রথম বিদ্রোহ ঘোষিত হলো।

তিনি কওমকে উদ্দেশ্য করে আরো বললেন– হে লোকগণ। তোমরা কেনো এরূপ দেবতা খরিদ করো? খরিদ করে কেনো এদের পূজা করো? যা তোমাদের কোনো উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না।

কিন্তু কোনো যুক্তি তারা শুনলো না।

একই যুক্তি দিয়ে তারা বললো– আমরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চাই না। আমরা তো এটাই জানি যে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এভাবেই করে এসেছে। অতএব আমরাও তাই করছি।

ইব্রাহিম আ. বললেন, যদি তাই করতে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের এই মূর্তিগুলি সম্বন্ধে এমন চাল চালবো– যা তোমাদেরকে উত্যক্ত করে ছাড়বে।

যে বয়েসে শিশুর কিংবা বালকের ইন্দ্রিয় থাকে সবচেয়ে সজাগ, গ্রহণশীল; ঠিক সেই বয়েসটাই তিনি কাটালেন শিরকের কেন্দ্র স্থলে। অথচ গড্ডালিকাকে তিনি মেনে চলতে শেখেননি। নেননি মেনে।

নবী ও রসূলগণ জন্মগতভাবে জ্ঞানী, নিষ্পাপ। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, আল্লাহ্তায়ালা ইব্রাহিম আ. সম্পর্কে স্বয়ং ঘোষণা দিচ্ছেন 'আমিতো এর পূর্বে ইব্রাহিমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।'

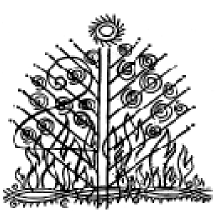

চার

মরুভূমি আর পাহাড়।

ধু-ধু উত্তপ্ত বালি আর লু-হাওয়া।

মাঝে মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে হারিয়ে যেতেন নিসর্গে।

বাইরের প্রকৃতি কি তার শিক্ষক? না, স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালা। মাঝে মধ্যে খুবই বিষণ্ন হতেন তিন। কিন্তু কেনো? ঘর ও বাইরের বিরুদ্ধবাদী যন্ত্রণায়? নাকি আপন মনে বুঝতে চাইতেন মহান প্রভুকে?

একদিন। ঘর ছেড়ে সবাই চলেছে বাইরে।

বাইরে উৎসব। বাৎসরিক উৎসব।

বছরের এদিনটিতে দেশের প্রচলিত নিয়মে আনন্দমেলা বসে। কওমের লোকেরা, ধর্মনেতারা, মোহন্তরা, আনন্দ উৎসবে অংশ নিতে প্রায় সবাই মেলায় যোগ দিতে চলেছে।

কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

কওমের লোকেরা বললো– ওহে ইব্রাহিম। তুমি মেলায় যাচ্ছোনা?

তিনি নিশ্চুপ। দূর আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন নির্ণিমেষে। তারা পুনঃ বললো, আরে চলো চলো– সবাই যাচ্ছে, তুমি একা থাকবে কেন? কওমের লোকেরা মেলায় যাবার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করলেন অন্যভাবে। হজরত ইব্রাহিম একই ভঙ্গিতে আকাশের তারকারাজির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'ইন্নী সাকিম'। আমি অসুস্থতা বোধ করছি।

যেহেতু কওমের লোকেরা নক্ষত্রপূজক ছিলো, স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদের ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে ধরে নিলো– নিশ্চয় কোনো অপয়া তারকার কুদৃষ্টিতে পতিত হয়েছেন ইব্রাহিম। অতএব বিস্তারিত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ইব্রাহিম আ.কে রেখে তারা মেলায় চলে গেলো।

এ প্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনের ভাষ্য– 'অতঃপর ইব্রাহিম তারকারাজির দিকে একবার তাকালেন এবং বললেন, 'আমি অসুস্থতা বোধ করছি। অতঃপর ওরা তাঁকে পশ্চাতে রেখেই চলে গেলো।'

মোহন্ত, ধর্মীয় নেতা তথা পৌত্তলিক সমগ্র জাতি মেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো। তারা নেশায় মত্ত। নাচ, গান স্ফুর্তিতে হই–হুল্লোড়, আর মাতলামীতে গুলজার হয়ে নিজেদেরকে মাতিয়ে রাখলো মেলায়।

হজরত ইব্রাহিম আ. ভাবলেন, এটাই তো তাঁর সুযোগ। তিনি সন্তর্পণে সবচেয়ে বড় দেবতার মন্দিরে ঢুকে পড়লেন। তখনো মন্দিরে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন কিসিমের অনেকগুলি মূর্তি।

কাঠের মূর্তি, মাটির মূর্তি, পাথরের মূর্তি।

এরাই আবার ওদের ছোট বড় দেবতা।

তিনি দেখতে পেলেন– তথা কথিত দেবতাদের সম্মুখে পড়ে আছে হরেক রকমের মিষ্টি, রকমারি ফল ফলাদি। নিপুণভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সে সব দেবতাদের সম্মুখে, ভোগের জন্য।

নিদারুণ কৌতুক বোধ করলেন তিনি। শুধু কৌতুক নয় পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা করেই একটা কর্মপন্থা গ্রহণ করে তিনি মূর্তিগুলির উদ্দেশ্য বলে উঠলেন– কিহে! এতো সমস্ত সুস্বাদু ভোগের বস্তু বিদ্যমান, তোমরা খাওনা কেনো?

নিতান্ত রসিকতা বৈ কিছু নয়।

অতঃপর আরো বলতে লাগলেন– ব্যাপার কি? আমি কথা বলছি, অথচ তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেনো?

যথা পূর্বং তথা পরং।

অতঃপর ক্ষুব্ধ হয়ে আঘতের পর আঘাত হেনে দেবতাদের তিনি মাটিতে লুটিয়ে দিলেন। বলাবাহুল্য মন্দিরে ঢোকার পূর্বে তিনি নিজের সঙ্গে একখানা কুঠার এনেছিলেন এবং কুঠারটি দিয়েই মূর্তিগুলো চূর্ণ করে ফেললেন শুধু মাত্র বড় মূর্তিটি ছাড়া। বড় মূর্তিটির কাঁধে অতঃপর কুঠারখানা চড়িয়ে এক সময় বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে হজরত ইব্রাহি আ.।

এ সম্বন্ধে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে– 'তিনি সন্তর্পণে ওদের দেবতাদের কাছে গেলেন এবং বললেন তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছো না কেনো? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছোনা? অতঃপর তিনি ওদের উপরে আঘাত হানলেন।'

আরো এরশাদ হয়েছে 'অতঃপর তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন মূর্তিগুলিকে, ওদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে ওরা এর শরণাগত হয়।'

যখন সবাই মেলা থেকে ফিরে এলো এবং মন্দিরের মূর্তিগুলোর করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করলো তখন প্রায় সকলেই দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো–

... এটা কি হলো?

... কে এই কাণ্ড করলো?

এদের মধ্যে একটি লোক ছিলো– যার সম্মুখে ইব্রাহিম আ. বলেছিলেন 'শপথ আল্লাহ্‌র তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা নেবো।'– সেই লোকটাই তড়িৎগতিতে বলে উঠলো– এটা সেই ইব্রাহিমের কাজ। সেই তো এ রকম বলেছিলো বটে।

কেউ কেউ বললো, আমরা ইব্রাহিমকে নিশ্চয় দেবতাদের সম্পর্কে কটুক্তি করতে শুনেছি।

নেতৃস্থানীয় লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কি শুনেছো? বলো।

একটি লোক বললো, ইব্রাহিম বলেছিলো, 'আমি তোমাদের এই মূর্তিগুলি সম্বন্ধে এমন চাল চালবো, যা তোমাদের উত্যক্ত করে ছাড়বে।'

নেতারা বললো, তাঁকে উপস্থিত করো সবার সামনে।

অতঃপর হজরত ইব্রাহিম আ.কে যখন ধরে আনা হলো, তিনি ছিলেন তখনো নির্ভয়।

নেতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, ওহে ইব্রাহিম! তুমি কেনো আমাদের দেবতাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছো?

হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমরা অযথা আমাকে দোষী করছো। বরং ঐ বড় মূর্তিটাই এটা করেছে। ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখোনা।

– তুমি মূর্খের মতো কথা বলছো ইব্রাহিম।

– কারণ?

– ও কি কথা বলতে পারে?

– তাহলে কেনো ওদেরকে দেবতা বলে পূজা করো তোমরা? হজরত ইব্রাহিম আ. এর যুক্তিপূর্ণ উক্তির কি জবাব দেবে তারা? ধর্মীয় নেতারা লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করলো বটে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে।

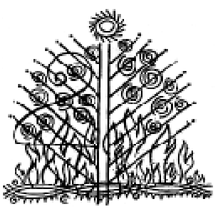

পাঁচ

তারা হজরত ইব্রাহিমকে বাদশাহের দরবারে হাজির করলো। ইব্রাহিম আ. এর উপযুক্ত বিচার চায় তারা।

বাদশাহ্ নমরুদ আদ্যপান্ত শুনলো ব্যাপারটা। শুনে মনে মনে আগুন হলো।

নমরুদ বললো, ওহে ইব্রাহিম! তুমি পূর্বপুরুষের ধর্মের বিরোধিতা করছো কেনো? কি হয়েছে তোমার?

হজরত ইব্রাহিম বললেন, কাঠ-পাথরের নিস্প্রাণ মূর্তি, আমার প্রভু হতে পারে না।

-তাহলে আমাকেই প্রভু মানো। নাকি তাও মানতে চাওনা?

-আমি এক আল্লাহ্রই পূজারী, তিনি সব কিছুরই স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ: অতএব প্রভু হতে তুমি পারো না।

-খামোশ। -গর্জে উঠলো বাদশাহ্ নমরুদ।

এখন ক্রুদ্ধ সে। একে তো মন্দিরের দেবতাদের নাজেহাল করার নালিশ জ্বলছে তার মাথায়। এ মুহূর্তে আবার নতুন কথা শুনে নমরুদ ক্রোধে অধীর হয়ে পড়লো। তার খোদায়ী অস্তিত্বের বিপক্ষে স্পষ্ট ভাষণে নমরুদ তেলে বেগুনে জ্বলে

উঠলো। কিন্তু চতুর সে। নমরুদ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলো, ওহে ইব্রাহিম! তোমার সেই প্রভুর হাকীকত কি?

-তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

কলের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠলো নমরুদ। বললো, এ আর এমন কঠিন কাজ কি? জীবন মৃত্যু তো আমারও ক্ষমতায় রয়েছে। দেখতে চাও? কৈ হায়– রক্ষী, শান্ত্রীরা ত্রস্তে ছুটে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। নমরুদ সাংকেতিকভাবে ইঙ্গিতে শুধু বললো– বন্দীদ্বয়। মুখের উচ্চারণ মাত্র। তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ পালিত হলো।

দু'জন বন্দীকে দরবারে হাজির করা হলো।

এর মধ্যে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী।

অন্যজন বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত। শীঘ্রই তাকে মুক্তি দেয়া হতে পারে; শুধু বাদশাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা।

নমরুদ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে দেখিয়ে বললো, এই লোকটির মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত দিনে– নির্দিষ্ট সময়ে জল্লাদ তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতো। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আদেশ দিলাম, সে বেকসুর খালাস। আমি তাকে জীবন দান করলাম। এবং ঐ লোকটি বিচারে সে যদিও সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত। সে যে কোনো মুহূর্তে মুক্তি পেতে পারতো। আমি আদেশ দিলাম– জল্লাদ এক্ষুণি তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে! অর্থাৎ আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হলো।

বাদশাহ্ নমরুদ হজরত ইব্রাহিম আ. এর দিকে এবার দৃকপাত করে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো। বললো, দেখলে তো ইব্রাহিম! জীবন মৃত্যুর চাবিকাঠি আমার হাতেও আছে। তাহলে পৃথক কি বৈশিষ্ট্য থাকলো তোমার আল্লাহ্র? বলো হে এবার?

বক্রবুদ্ধিবিশিষ্ট নমরুদ জীবনমৃত্যুর গুরুত্ব বুঝতে অক্ষম। আসলে জীবনমৃত্যুর প্রকৃত হাকীকত সে কি বুঝতে পারেনি? নাকি এও ছিলো তার কুটকৌশল? প্রজাসাধারণের সামনে নিছক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করাই কি তার উদ্দেশ্য?

হজরত ইব্রাহিম আ. চিন্তা করলেন, যদি এখন জীবন ও মৃত্যুর সূক্ষ্ম দর্শন নিয়ে তিনি বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েন– তাহলে নমরুদের উদ্দেশ্য সফল হবে। জনসাধারণকে ভুলের ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন রেখে সে আসল ঘটনাটাকে আড়াল করে ফেলবে।

হজরত ইব্রাহিম আ.কে নিশ্চুপ দেখে নমরুদ সোৎসাহে বললো, ওহে ইব্রাহিম! আর কিছু বলবে?

ইব্রাহিম আ. বললেন, অবশ্যই বলবো। আমি সেই সত্তাকে আল্লাহ্ বলি, যিনি প্রতিদিন সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত করেন। তুমি যদি অনুরূপ খোদায়ী দাবী করো– তাহলে এর বিপরীত অর্থাৎ পশ্চিম দিকে উঠিয়ে দেখাও।

এরকম কথা শোনার জন্য নমরুদ একেবারেই প্রস্তুত ছিলো না। হতবুদ্ধি হয়ে লা-জবাব হয়ে গেলো সে। খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো নমরুদ। তার মানসচোখে সহসা ভেসে উঠলো বহু দিন আগের একটি ছবি। নজুম ও যাদুকরগণের চোখে মুখে বিষাদের ছায়া। একটা ভয়কংর দুঃসংবাদ শোনাতে ইতস্ততঃ করছে তারা। নমরুদ অভয় বাণী শোনালো তাদেরকে, বলো– নির্ভয়ে বলো তোমরা।

তাদের মধ্যে একজন নজুম বললো, জাহাপনা। ফলকের মধ্যে এমন এক ‘সেতারা’ উদিত হয়েছে, যা দেখে আমরা রীতিমত আতংকিত হয়েছি।

–কারণ?

–ইতিপূর্বে এরকম নক্ষত্র কখনো দেখিনি জাহাপনা।

–কি হলো তাই বলো।

–নক্ষত্রগণনা করে দেখা গেলো– ভয়ংকর এক বিপদ আপনার সামনে, তিনি আসছেন......

–তিনি আসছেন। আমার ভয়ংকর বিপদ–

–জ্বি হ্যাঁ জাঁহাপনা।

–যেমন?

–এই শহরের মধ্যে অচিরেই এক অসাধারণ শিশু জন্ম গ্রহণ করবেন। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যেই শিশুটি তাঁর মাতৃগর্ভে স্থান নেবেন।

–বুঝলাম। কিন্তু বিপদের ধরন কি রকম হে?

সেই শিশুটি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে আপনার মৃত্যুর কারণ হবে জাঁহাপনা।....উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সত্যকে নিয়ে আসছেন তিনি।

–খামোশ! হুংকার ছুড়লো নমরুদ। এ-অসম্ভব। আমি এটা হতে দেবো না। কৈ হায়....ত্রস্ত শান্ত্রীরা ছুটে এলো। নির্দেশ হলো, যাও–সবাইকে বলে দাও, এই মুহূর্ত থেকে শহরে বন্দরে শাহী ঘোষণা জারী করে দাও.....আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত শহরের কোনো পুরুষ কোনো নারীর সংস্পর্শে যেতে পারবে না। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে তাহলে সবংশে তাদেরকে হত্যা করা হবে। যাও–।

শাহী লোকজন ফরমান নিয়ে ছুটলো জারী করতে। কিন্তু তামাম মখলুকাতের মালিক যিনি, তাঁর সিদ্ধান্ত যে অন্যরকম।

তিন দিন পর।

নজুম ও যাদুকরদের পুনঃ ডেকে আনা হলো দরবারে।

নমরুদ বলল, আমার জানের শত্রু কি তাঁর মাতৃ উদরে সত্যি সত্যি জন্ম লাভ করেছে হে নজুম? বাদশাহ্ নমরুদের ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

–জাঁহাপনা–। নজুম দ্বিধন্বিত।

–নির্ভয়ে বলো।

–জী হাঁ, তিনি জন্মলাভ করেছেন।

–অসম্ভব। যেনো সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠলো নমরুদ। ক্রোধ ও শঙ্কা যেনো তাকে নাচিয়ে তুলেছে।

কিন্তু বৃথাই আস্ফালন।

আবার শাহী ফরমান নিয়ে ছুটলো লোকজন। শহরের ঘরে ঘরে তাদের সদর দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত হলো। শাহী ফরমানটি হলো এইঃ কথিত তারিখ থেকে গণনা করে যার ঘরে পুত্র সন্তান ভুমিষ্ঠ হবে– তাকে সবংশে কতল করা হবে।

হঠাৎ করেই স্বপ্নভঙ্গ হলো নমরুদের। এই মুর্হূতে সে ভাবলো, তবে কি– তবে কি আমার সেই জানের শত্রু এই ইব্রাহিম? বাদশাহ্ নমরুদ স্বপ্ন থেকে যেনো বাস্তবে ফিরে এলো। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সে একইভাবে তাকিয়ে থাকলো হজরত ইব্রাহিম আ. এর চোখের দিকে।

হঠাৎ নমরুদ ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলো, ও হে ইব্রাহিম আমি বেশ বুঝেছি– তুমি আমার শত্রু...।

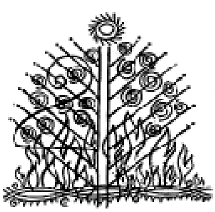

ছয়

অতঃপর বিচারের প্রহসন চললো।

পৃথিবীতে সত্যের অনুসারীদের উপর এমনিভাবেই নেমে এসেছে নির্যাতন। এ তাঁদের তকদীরের লিখন।

বাদশাহ্ থেকে শুরু করে সকল প্রজা সাধারণ পর্যন্ত সবাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলো যে, দেবতাদের অপমান এবং পূর্ব পুরুষদের ধর্মের বিরোধিতার অপরাধে অপরাধী ইব্রাহিমকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক।

পিতা শত্রু। জনতা শত্রু। সমকালীন বাদশাহ্ও জানের শত্রু। চারদিকে শত্রুতা আর শত্রুতা।

শুধুমাত্র ইব্রাহিম আ. একাকী একদিকে। সঙ্গী নেই। জনসমর্থন নেই। কি দিয়ে মোকাবিলা করবেন তিনি বাতিলকে। কি দিয়ে জয়ী হবেন? শক্তি? সাহস? না আধ্যাত্মিকতা দিয়ে? শত্রুপক্ষ শুধু বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ করেই ক্ষান্ত নয়। তাঁকে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করতে এখন সবাই সংকল্পবদ্ধ। এমন সংকটকালে কে হবেন তাঁর সাহায্যকারী? কে হবেন উদ্ধারকারী?

আছেন একজনই।

এ কারণেই কোনো পরোয়া ছিলো না হজরত ইব্রাহিম আ. এর। পূর্বের মতোই তিনি নিঃশঙ্কচিত্ত। শত্রুদের প্রতি নির্লিপ্ত। সত্যপ্রচারে তবু অকুতোভয়। হাঁ, একমাত্র ভরসা মহান প্রভু, আল্লাহ্তায়ালা।

অগ্নিকুণ্ডের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করা হলো।

একাধারে কয়েকদিন সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে রাখা হলো। যার ফলে আগুনের লেলিহান শিখা আশে পাশে সবকিছুকে ঝলসে দিতে শুরু করলো।

যখন তাদের প্রতীতী জন্মালো– এই অগ্নিকুণ্ড থেকে বেচেঁ আসবার কোনো উপায় ইব্রাহিমের নেই, তখন তারা এক বিশেষ কৌশলে হজরত ইব্রাহিম আ.কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো।

দুশমন শক্তিমান বটে, কিন্তু রক্ষাকারী যে সর্বশক্তিমান।

পবিত্র কোরআনে ইব্রাহিম আ. এর এই ঘটনাকে অত্যন্ত চমকপ্রদ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে– 'ওরা বললো, এর জন্যে এক অগ্নিকুণ্ড তৈরী করো। অতঃপর তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করো।'

'ওরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলো কিন্তু আমি ওদেরকে হীন করে দিলাম।'

'ইব্রাহিম বললো– আমি আমার প্রতিপালকের দিকে গমন করলাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।'

'তখন আমি বললাম– হে আগুন। তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

এবং আগুন তৎক্ষণাৎ শীতল ও শান্তিময় হয়ে গেলো। আগুনের দাহিকাশক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশেই একটি পশমও দগ্ধ করতে সক্ষম হলো না।

একজন ধার্মিক লোক এই ঘটনাকে অর্থাৎ অগ্নি শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবেন। কারণ, পবিত্র কোরআন তাঁকে এই প্রতীতী দিয়েছে। বস্তুতঃ ঘটনাটি এমন একজন মানুষের জীবনে ঘটেছে যাঁর জীবনের প্রতিটি দিক নবীসুলভ নিষ্কলংকতায় ভরপুর। পবিত্র কোরআন মজীদ সেই সমস্ত বিস্ময়কর তথ্যাদিও প্রদান করেছে।

সাত

জীবনের সব সীমানায় গ্রহণযোগ্যতাকে তুলে আনতে চান তিনি। কিন্তু জীবন তো মসৃণ নয়। জীবনের চারপাশে অজস্র কাঁটা বেড়াজাল।

পিতা আজর স্পষ্ট জানিয়েছে, তুমি বিদায় হও। দূর হয়ে যাও চিরদিনের জন্যে।

হজরত ইব্রাহিম জবাবে বললেন, তাই যাচ্ছি পিতা। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তিনি তো আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আপনার নিকট হতে বিদায়....।

পিতার প্রতি চাপা অভিমান, কওমের উপর প্রচণ্ড দুঃখবোধে তাড়িত হয়ে হজরত ইব্রাহিম আ. দেশত্যাগ করলেন। তিনি কতো যে ব্যাকুল ছিলেন– তাঁর সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের জন্যে। পিতাকে আল্লাহ্‌র একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কিন্তু সবই তো ব্যর্থ হলো।

এবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। কোথায় যাবেন তিনি? সিরিয়া? না অন্য কোথাও?

হ্যাঁ, যেখানেই হোক যেতেই তাঁকে হবে। তৌহিদে এলাহীর প্রচার তাঁকে করতেই হবে।

সত্যি একদিন যাত্রা শুরু হলো।

যেতে যেতে পথিমধ্যে ‘খাজায়েনুল ইজনে’ নামক একদেশে এসে উপস্থিত হলেন তিনি।

তিনি এখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন– উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে অনেক লোকজন কোথায় যেনো যাচ্ছেন। কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, ওহে ভাই সকল। আপনাদের গন্তব্য কোনদিকে?

জবাব এলো– রাজমহলে। –এ দেশের রাজকন্যার বিবাহের স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দিতে যাচ্ছি।

নতুন কথা শুনে তিনি দারুন কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। নামী দামী শাহজাদাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চললেন রাজমহলের দিকে। শাহাজাদীর স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠানটি দেখতে চান তিনি।

শরীরে তাঁর উত্তম পোশাক নেই। নিতান্ত দীন হীন ফকির বেশ। নিজেকে বেমানান মনে হলেও অনাহুত ভাবলেন না তিনি।

শাহাজাদীর রূপ গুণের অনেক কথা শোনা গেলো। তার রূপে গুণে অনেকেই মুগ্ধ। এবং গুণগ্রাহীরা দেশ-বিদেশের রাজকুমার, রাজন্যবর্গ, শাহাজাদা।

একসময় পৌঁছে স্বয়ম্বরা সভার এক কোণে ঠাঁই নিলেন হজরত ইব্রাহিম আ.। শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটির ক্রিয়াকাণ্ড তিনি দেখতে চান।

অধীর প্রতীক্ষা অনেকের।

শাহাজাদী যাঁকে পছন্দ করবেন– তাঁকেই বরমাল্য পরাবেন।

হজরত ইব্রাহিম কৌতুহলী দর্শক মাত্র।

এক সময় রাজকন্যাকে দেখা গেলো রাজমঞ্চের উপরে। চার পাশে উপবিষ্ট শত সহস্র রুপ পিপাসু রাজপুরুষ। রাজ কুমারীকে দেখে চঞ্চল হলো সবাই।

সময় বয় কি বয় না– বোঝা যায় না।

রাজ পুরুষেরা উৎকণ্ঠিত। একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। এ রত্ন কার হবে? কেউ জানেনা রাজকন্যার বরমাল্য কোন কণ্ঠে ঝলসে উঠবে? কে সেই বীর্যবান পুরুষ।

রাজকন্যা তাকালেন সবার দিকে। একে একে দেখতে থাকলেন সবাইকে।

হঠাৎ রাজকন্যার দৃষ্টিটা স্থির হয়ে গেলো একজনের উপর।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে তিনি অপলক চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

অদ্ভুত ব্যাপার। রাজকন্যাতো দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না আর। কি আছে সেই মুখমণ্ডলে? কি দেখছেন তিনি সেই পুরুষের ললাটে? রাজটীকা? না অন্য কিছু? হ্যাঁ, অন্য কিছুই। সৌন্দর্যের অমন অপার্থিব অপরূপ লীলা বৈচিত্র দেখামাত্রই বুঝি রাজকন্যা আর কোনোদিকে দৃকপাত করতে পারলেন না।

চলে এলেন ভাগ্যবান পুরুষটির দিকে ধীরপায়ে এবং তাঁর গলায় এক সময় বরমাল্যটি পরিয়ে দিলেন। চার দিকে করতালি পড়লো।

সকলের দৃষ্টি এখন নব্য রাজজামাতার দিকে। ভাগ্যবান বটে। ভাগ্যবান? কে ভাগ্যবান?

নব্য জামাতা? না রাজদুহিতা?

বলাবাহুল্য বাদশাহ্ স্বয়ং দীনহীন ফকির বেশী হজরত ইব্রাহিম আ.কে সাদর সম্ভাষণে জামাতা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। রাজহেরেমে তুলে নিলেন তাঁকে।

আট

হয়তো আকাশে চাঁদ ছিলো। স্নিগ্ধ হাওয়া ছিলো। গবাক্ষপথে মধু চন্দ্রিমার তীব্র জ্যোৎস্না কক্ষের বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়েছিলো হয়তোবা। নবদম্পতি চেয়ে চেয়ে তা দেখবেন। বোবা মুহূর্ত গড়িয়ে যাচ্ছিলো। এক সময় নীরবতা ভাঙ্গলেন ইব্রাহিম আ.। আমার পরিচয় জানতে চাওনা সারা?

পরিচয় তো পেয়েছি আপনার পেশানীতে, নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন কি? মিষ্টি হেসে বললেন, নব পরিণীতা স্ত্রী, বিবি সারা।

–কি দেখেতে পেলে পেশানীতে?

– সেতো বলা যায় না স্বামীন। কিন্তু এমন কিছু, যা– সাধারণের মধ্যে থাকতে পারে না। এ যে অপার্থিব কিছু।

–কিন্তু আমি তো অতি সাধারণ জন। কোনো নবাব বাদশাহের পুত্র নই। আমার জন্মভূমি বাবেল দেশে, নাম ইব্রাহিম ইবনে আজর।

–আপনি কি সেই ইব্রাহিম?

–কার কথা বলছো?

–যাকে মহাপাপী নমরুদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো।

–তোমার অনুমান সত্য।

–আমি ধন্য আমি ধন্য।

–ধন্য কেনো বলছো সারা?

–এই জন্যে বলছি– পাপিষ্ঠ নমরুদ এবং তার অনুসারীরা যাকে না চিনে কষ্ট দিয়েছিল আমি অন্ততঃ তাকে দেখে চিনতে ভুল করিনি বলে। আপনার সেই অগ্নি পরীক্ষার পর থেকে আপনার প্রতি অনেক আগ্রহ জমে আছে আমার।

–আগ্রহ কেনো?

–আজ থাক। বরং অনুমতি দিন, কিছু অন্য প্রশ্ন রাখি?

–নিঃসংকোচে প্রশ্ন রাখতে পারো সারা।

–আচ্ছা তাহলে বলুন, বাদশাহ্ নমরুদের সঙ্গে আপনার সংঘাতের কারণ কি শুধু পার্থিব কিছু ছিলো?

–না। তুমি কিছু শোননি সারা।

–সামান্য।

–বরং বলতে পারো বিশ্বাসের লড়াই ছিলো। প্রচলিত কুফরী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তওহীদের লড়াই ছিলো। যারা তাগুতের পথে চলে, তারা কাফের। তৌহিদের বাণী ওরা সাইতে পারেনি। সংঘাত তো আসবেই।

–কি ছিলো সেই মহান তৌহিদের বাণী? শোনাবেন?

–অবশ্যই। তা ছিলো 'লা-ইলাহা ইল্লালাহু ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ্।' সারা! এই সময়ের এটাই দ্বীনের শুদ্ধতম উচ্চারণ।

–তাহলে আপনিও শুনুন, আমিও পরম বিশ্বাসে দ্বীনের এই শুদ্ধতম উচ্চারণ পাঠ করছি–'লা-ইলাহা ইল্লালাহু ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ্।' বিবি সারা দ্বীনের কলেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হজরত ইব্রাহিম বললেন, সারা, তুমি আজ সত্যি হক দ্বীন গ্রহণ করলে।

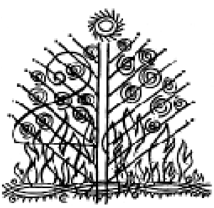

নয়

এক ধরনের অস্বস্তি আর বিষণ্নতা মনকে যেনো ছুঁয়ে যাচ্ছিলো এই রাজগৃহ, এই আরাম–আয়েশ, এই সমাদর আর মধুর স্ত্রীসাহচার্য। সব পেয়েও তাঁর মনে হচ্ছিলো–কি যেনো চাই------কি যেনো আরো চাই---------। কি সেটা?

সেকি সুদূরের তৃষ্ণা? অহরহ সেই তৃষ্ণা তাঁকে যেনো হাতছানি দিচ্ছে? স্ত্রী–বিবি সারার ভালবাসায় তিনি সুখী, কিন্তু তৃপ্ত হতে পারছেন না কেনো? কে যেনো ভেতর থেকে সর্বক্ষণ ডেকে যাচ্ছে– বেরিয়ে পড়ো–বেরিয়ে পড়ো।

অতঃপর হজরত ইব্রাহিম আ. সেই দেশে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন।

কিন্তু না, তাতেও তৃপ্তি আসে না। এরপরে সুদূরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরো বেড়ে গেলো। এবার যে তাকে বাঁধন ছিঁড়তেই হবে।

একদিন।

বিবি সারার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ালেন তিনি। খুবই কোমল স্বরে ডাকলেন– সারা।

–বলুন।

–আমাকে যে এবার যেতে হবে সারা।

– কোথায়?

–ঐ যে বলেছিলাম মানুষকে সময়ের উচ্চারণ শোনাতে।

বিবি সারা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তবে আমাকেও সঙ্গে নিন।

– তোমাকে! সে কি হয়?

– কেনো নয়? আমি কি আপনার সাহায্যে আসতে পারি না?

–আবশ্যই পারো? কিন্তু সে যে অচেনা–অজানা পথ পরিক্রমা। তাছাড়া? তুমি নারী, তোমার নিরাপত্তার দিকটাও আছে। আমার সফরের কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়।

–আমার নিরাপত্তার জন্যে আল্লাহ্তায়ালাই যথেষ্ট। আমি আপনাকে ছেড়ে একা থাকতে চাইনা স্বামীন।

–কিন্তু তোমার পিতা? তিনি কি রাজী হবেন?

– সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন।

হজরত ইব্রাহিম বিবি সারার কথা শুনে খুবই প্রীত হলেন। তিনি আর আপত্তি করলেন না। শ্বশুর-বাদশাহ্ও শেষমেষ সম্মতি দিলেন।

শুরু হলো যাত্রার আয়োজন।

সহযাত্রী, যাত্রার বাহন, উপঢৌকন, সবকিছুই তৈরী হলো। কিন্তু বিচ্ছেদ–মুহূর্ত বড় কষ্টের, স্বেচ্ছায় নির্বাসন প্রার্থনা করে নিলেও যাত্রার মুহূর্তে হৃদয় কাঁদছে কেনো বিবি সারার। এই রাজগৃহ, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, সুবৃহৎ প্রসাদের এতো লোকজন– সবাই পর হয়ে যাচ্ছে বলেই কি?

হৃদয়ে এ যে অন্য রকম তোড়পাড়।

সব নারীদের কি এরকম হয়? বিবি সারা মনে মনে ভাবছেন অনেক কথা। দু' চোখে তার অশ্রুর বন্যা।

কাফেলা চলেছে।

আকাশে ধূসর খণ্ড খণ্ড মেঘ ছিলো। প্রখর রৌদ্র ছিলো। আরো ছিলো, আপনজনদের বিয়োগ ব্যথা। কিন্তু এতোকিছুর মাঝেও স্বামী–সাহচর্যের এক স্বপ্নমধুর চাপা উত্তেজনাও ছিলো।

সম্মুখে দুস্তর বন্ধুর পথ।

কখন যেনো চেনা অচেনা ঘর বাড়ী ছাড়িয়ে গেলো। ফলের বাগান। ফসলের ক্ষেত। দূরে দূরে ধূসর নৈসর্গিক বিস্তার। কখনো বালিয়াড়ি পথ। কখনো কঠিন পাথুরে খাদের গিরি পথ। কাফেলা চলছেই----

উটের পিঠে হাওদায় বসে বিবি সারা আনমনে কতোকিছুই দেখছেন, কতোকিছুই ভাবছেন–।

হজরত ইব্রাহিম আ. ভাবছিলেন অন্য কথা। তিনি ভাবছিলেন এখন তাঁকে এমন একটি বসতির দিকে চলে যেতে হবে, যেখানকার লোক সত্যকে মনোযোগ

দিয়ে শুনবে। আল্লাহ্‌র দুনিয়া ক্ষুদ্র নয়। সত্যকে যেভাবেই হোক প্রচার করা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব। অবশ্য দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালাই করবেন।

অতঃপর ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরের নিকটবর্তী উরকাল দানিয়ীন নামক একটি জনবসতিতে তাঁর কাফেলা এসে থামলো। কোনো কোনো কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে হজরত লুত আ.ও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি কিছুদিন উরকালদানিয়ীন নামক বসতিতে অবস্থান করে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। তারপর সেখান থেকে হা-রানের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এবং সেখানেও 'দীনে হানিফ' এর প্রচার কাজ জোরে শোরে শুরু করে দিলেন।

এই প্রবাস জীবনে এসেও হজরত ইব্রাহিম আ. কিন্তু স্বীয় পিতামাতাকে ভোলেননি। বলা হয়ে থাকে তিনি ঐ সময়েও আপন পিতা আজরের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

তিনি চারিত্রিকভাবে ছিলেন যেমন আপোষহীন বিপ্লবী তেমনি প্রয়োজনে অত্যন্ত কোমল হৃদয়। দয়া, সহনশীলতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। এ কারণে পিতা আজরের পক্ষ থেকে সর্বদা সর্বপ্রকার শত্রুতা প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আল্লাহ্‌র দরবারে পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা শেষ পর্যন্ত হজরত ইব্রাহিম আ.কে এই মর্মে অবহিত করলেন– আজর কখনও ঈমান আনবে না, বরং সে ঐ সমস্ত লোকের অর্ন্তভুক্ত, যাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে– 'আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর ও কান মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ।'

হজরত ইব্রাহিম আ. যখন এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ পেলেন, তখন তিনি স্বীয় পিতার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। পবিত্র কোরআনে সুরা তওবায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ-

'......ইব্রাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো। কারণ, পিতাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বলে, অতঃপর যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু; তখন ইব্রাহিম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। ইব্রাহিম তো ছিলো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।'

এভাবেই তৌহিদের প্রচার করতে করতে হজরত ইব্রাহিম আ. ফিলিস্তিনে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি ফিলিস্তিনের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেন। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলটি ছিলো 'কেনআনীর' শাসনাধীন। শীঘ্রই তিনি সেখানে থেকে শাকীমে চলে যান এবং সেখানেও কিছুদিন অবস্থান করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সম্মুখে মিশর সীমান্ত।

মিসরের বাদশাহ্ ছিলো ব্যভিচারী। সুন্দরী রমণীদের প্রতি তার আপত্তিকর দুর্বলতা ছিলো। আর সেই নারীর স্বামী সঙ্গে থাকলে তো রেহাই ছিলো না। নির্বিচারে প্রাণ দিতে হতো স্বামীকে।

মিসরের অভ্যন্তরে সীমান্ত চৌকি ছিলো সদাসতর্ক। চৌকির প্রহরায় ছিলো সীমান্ত রক্ষী।

সুনিপুণ কর্মতৎপর ছিলো তারা। ধৃত হলেন বিবি সারাসহ হজরত ইব্রাহিম আ.। রক্ষীরা উল্লাস প্রকাশ করছিলো বিবি সারাকে পেয়ে। প্রচুর এনাম মিলবে বাদশাহ্কে নারী উপঢৌকন দিলে। অচিরেই বন্দী করে হজরত ইব্রাহিম আ. ও বিবি সারাকে প্রেরণ করা হলো ব্যভিচারী মিসর রাজের রাজ–হেরেমে।

নিতান্ত বন্দীদশা তখন। এখানেও ধৈর্যের পরীক্ষা। এক সময়ে মিসর রাজের একান্ত দরবারে নীত হলেন হজরত ইব্রাহিম ও বিবি সারা।

ওহে বিদেশী! এই রমণী তোমার কে? প্রশ্নকারীর দুচোখ তখন কামাতুর। হজরত ইব্রাহিম তা প্রত্যক্ষ করলেন কিন্তু শংকিত হলেন না মোটেও। তিনি চিন্তিত মনে জবাব দিলেন– ভগ্নি।

–ভগ্নি? তোমার ভগ্নিকে আমাকে দিয়ে যাও, বিনিময়ে–

–না।

–না? প্রাসাদ কাঁপিয়ে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো বাদশাহ্। একটু পর হাসি থামিয়ে অন্যরকম স্বরে বলে উঠলো–জানো, তোমাকে আমি কি দিতে পারি?

–জানি।

–বলোহে–কি জেনেছো তুমি?

–মৃত্যুদণ্ড দিতে পারো।

–আলবৎ। কিন্তু না------ তোমাকে কোন দণ্ড নয়– বরং পুরস্কারই দিতে চাই। শোনহে বিদেশী খুব ভেবেচিন্তে কথা বলো– তোমাকে বুদ্ধিমান বলেই আমার মনে হয়েছিলো।

–কি বলতে চাও বাদশাহ?

–এই রমণীকে আমার হাতে সম্প্রদান করে তুমিতো নিশ্চিন্তে কিছু ধন ঐশ্বর্য বাগিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারো।

–এ সম্বন্ধে–মতামত দিতে আমি অক্ষম।

–কারণ?

–কারণ আমার ভগ্নি প্রাপ্তবয়স্কা। তার নিজস্ব মতামতই চূড়ান্ত।

–আলবৎ! বলোতো সুন্দরী। তোমার মতামতটা শোনাও তো দেখি। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছি।

সহসা জ্বলে উঠতে গিয়েও নিজেকে শান্ত রাখলেন বিবি সারা। এখন একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা রেখে মাথাকে ঠাণ্ডা রাখাই শ্রেয়। ভাবলেন তিনি। তিনি শীতল স্বরে বললেন– আমি এ বিষয়ে এই মুহূর্তে আমার প্রভু আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

–খামোশ! ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো মিসররাজ। প্রহুরীকে নির্দেশ করলো ইব্রাহিম আ.কে কারারুদ্ধ করে রাখতে। আর বিবি সারাকে নারী প্রহরীরা বাদশাহের এক কুৎসিৎ ইঙ্গিতে খাস্ মহলে নিয়ে গেলো।

বিবি সারাও শংকিত বটে, কিন্তু হতাশ নন। ইতিমধ্যে তাঁকে গোলাপের হাউজে গোসল করানো হয়েছে। সুগন্ধি আম্বর মাখিয়ে উৎকৃষ্ট শাহী পোশাকে সজ্জিত করা হয়েছে।

বিবি সারা এক সময়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদায় পতিত হলেন এবং মোনাজাত করলেন। কেতাবে বর্ণনা করা হয়েছে– 'আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ হলো হে জিব্রাইল। তুমি আমার খলীল ইব্রাহিমের কাছে যাও– তাঁর অন্তর চক্ষুকে খুলে দিয়ে এসো– যেনো ইব্রাহিম দূর থেকেও তাঁর বিবি এবং মিসররাজের আচরণ ও কথোপকথন শুনতে ও প্রত্যক্ষ করতে পারে।'

বিবি সারা মোনাজাত অন্তে দেখতে পেলেন, তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে কামার্ত বাদশাহ্। কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। হঠাৎ এ কি হয়ে গেলো। থর থর করে কাঁপছে মিসররাজ। চোখে মুখে তার এই মুহূর্তে ভয়ার্ত দৃষ্টি। কি হলো তার?

এদিকে পাপিষ্ঠ মিসররাজ নিজের অবস্থা দেখেবুঝে ভীত হলো। তার সারা দেহ অবশ, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছিলো। নড়বার এতটুকু শক্তি যেনো অবশিষ্ট নেই। নিজের শোচনীয় অবস্থা বুঝে সে বিবি সারার নিকট ক্ষমা চাইলো। অতঃপর বিবি সারা দোয়া করলেন আল্লাহ্‌র দরবারে।

সবকিছুই তো ছিলো আল্লাহ্‌র শান। পূর্ববৎ ভালো হয়ে গেলো সে এবং ভালো হয়েই পূর্বের ন্যায় বাদশাহ্ কামাতুর হয়ে বিবি সারাকে ধরবার জন্যে অগ্রসর হতেই একই প্রকার যন্ত্রণাদায়ক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পতিত হলো সে। তৎকালীন মিসররাজকে ফেরাউন বলা হতো। ফেরাউন মনে করলো, এটা নিশ্চয় জ্বীনের প্রভাব–প্রতিক্রিয়া । এই ধারণা করে সে পুনরায় বিবি সারার কাছে নিষ্কৃতি কামনা করলো।

বিবি সারা এবারো আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন। ফেরাউন ভালো হয়ে গেলো।

ফতহুল বারীতে বর্ণিত আছে, মিসরীয়রা জ্বিন এর উচ্চ মর্যাদা তথা মহত্বের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতো।

তাওরাত বলছে, ফেরাউন বিবি সারার এই ঘটনাকে অলৌকিক মনে করেছিলো।

কিন্তু ফেরাউন ভালো হয়েও ভালো হলো না। সেতো কুপ্রবৃত্তির দাস। এবারো তীব্রতম কার্মাত হয়ে পড়লো সে এবং বিবি সারাকে আলিঙ্গন করতে দ্রুত উদ্যত হতেই মারাত্মক অবস্থায় পতিত হলো এবার সে। যেনো সারা দেহ মন তার বিকল হয়ে গেলো। গুলিবিদ্ধ পক্ষীর মতো যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এই প্রথম ফেরাউন সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হলো। এবং এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বার বার অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো। অতঃপর ফেরাউন সত্যকে জানতে পারলো এবং সত্যের কাছে সে আত্মসমর্পণ করলো।

প্রকৃত তওবাকারীকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক বাদশাহ্ ফেরাউন স্বীয় কন্যাকে বিবি সারার হাতে তুলে দিলেন খাদেমা হিসাবে।

সহীহ বুখারীতে 'মালিকে জাব্বার' (অত্যাচারী বাদশাহ্) সম্পর্কিত আবু হুরায়রা রা. থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে তাতেও নিম্নের বাক্যটি রয়েছে– 'হাজেরাকে সারার হাতে সমর্পণ করলো যেনো সে তার সেবা করে'

তাওরাতের বর্ণনায় বলা হয়েছে– 'যখন মিসরের বাদশাহ্ সারার কারণে অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলো, তখন বললো– 'তার ঘরে আমার মেয়ে দাসী হয়ে থাকা অন্যের ঘরে রাণী হয়ে থাকার চেয়েও শ্রেয়।'

কাসাসুল কোরআনে 'বারাহীনে বাহিরাহ ফী হুররিয়াতী হাজিরাহ' গ্রন্থের উদ্ধৃতির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে– তাওরাতের মধ্যে হাজেরাকে দাসী বলার কারণ হলো, মিসরের বাদশাহ্ বিবি সারা এবং ইব্রাহিম আ. এর হাতে হাজেরাকে সমর্পণ করতে গিয়ে বলেছিলো, 'সে (হাজেরা) তাঁর (সারার) সেবিকা হয়ে থাকবে।'

এই সেবিকা অর্থ দাসী নয়। কেননা একথা প্রমাণিত যে, 'হাজেরা মিসরের ফেরাউনের কন্যা ছিলেন।'

সে যাই হোক, সত্যেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। অতঃপর বাদশাহ্ ফেরাউন হজরত ইব্রাহিম আ.কে, বিবি সারাকে উপযুক্ত মর্যাদা ও উপঢৌকন দিয়ে কন্যা হাজেরাসহ বিদায় দিলেন।

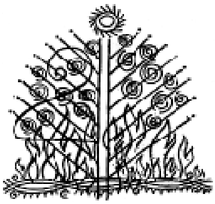

দশ

বলা হয়ে থাকে হজরত ইব্রাহিম আ. জীবনে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গুঢ়ার্থে তা মিথ্যে ছিলো না।

হজরত ইব্রাহিম আ. তাঁর দীর্ঘতম জীবনে বহু বিপদ আপদে, চরম সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এক একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় খলীলকে কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন যেন অটল ধৈর্যের পাহাড়।

জীবনের তিনটি ঘটনায় তিনি বৃহত্তর মহতী উদ্দেশ্যে ভিন্ন অর্থবোধক উক্তির রহস্যময়তায় নিজেকে আবরিত করেছিলেন মাত্র।

তার মধ্যে একটি ছিলো এমন যা– বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের কল্যাণ লাভের চেষ্টা মনে হলেও সত্যি কি তা ছিলো? অন্য দু'টি ঘটনাতে এমনই স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো, যাতে স্বীয় স্বার্থের লেশমাত্র ছিলো না। নিছক স্রষ্টার তৌহিদী প্রকাশ ও প্রচারই ছিলো সে সবের মূল উদ্দেশ্য।

পৌত্তলিক জাতিকে পৌত্তলিকতার অসারতা বুঝাবার বিশেষ কৌশল হিসেবে তিনি একদা দেব-দেবীর মূর্তিসমূহকে বিনাশ করবার সুযোগ সন্ধানে লিপ্ত ছিলেন। তাই একদা যখন দেশবাসী মেলায় যাবার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি শুরু করলো– তিনি কৌশলগতভাবে পেছনে থেকে যাবার উদ্দেশ্যে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন– ইন্নী সাকিম! অর্থাৎ আমি অসুস্থতা বোধ করছি। এই অসুস্থতা শারীরিক না হয়ে মানসিক হতেও তো পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিলো– কাফেরগণ যখন মেলা থেকে ফিরে এসে তাদের দেব-দেবীর বিচূর্ণ অবস্থা দেখলো– তখন তারা হজরত ইব্রাহিম আ.কে সন্দেহ করলো। শুধু সন্দেহ করা নয়– এজন্য দায়ীও করলো। ইব্রাহিম আ. এখানেও সুকৌশলে দেব-দেবীর অসারতা ও অক্ষমতা তুলে ধরার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন– 'বরং (আমি বলি) এদের মধ্যে ঐ বড় মূর্তিটাই এই কাণ্ড করেছে;.....।

তখন কাফেরগণ দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করলো– ওটা তো মাটির দেবতা। সেটা আবার অন্য মূর্তিগুলো ভাঙবে কিভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন– তাহলে যাদের ভালোমন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই, তাদের পূজা অর্চনা কেনো করছো তোমরা?

তৃতীয়টি ছিলো– ব্যাভিচারী মিসররাজ যখন হজরত ইব্রাহিম আ.কে জিজ্ঞাসা করলো– ওহে বিদেশী। রমণীটি তোমার কে হয়?

তিনি বলেছিলেন – ভগ্নি।

স্বীয় স্ত্রীকে ভগ্নি বলার ব্যাখ্যায় স্বয়ং ইব্রাহিম আ. বিবি সারাকে এক পর্যায়ে বলেছিলেন– 'আমরা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মোমেন। অতএব মোমেন ও মোমেনা পরস্পর ভাই ও ভগ্নি।' (বোখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ড)।

এই অর্থে হজরত ইব্রাহিম আ. স্বীয় স্ত্রীকে 'দ্বীনি ভগ্নি' মনে করেই মিসর রাজকে ভগ্নি কথাটা বলেছিলেন।

যাহোক হজরত ইব্রাহিম আ. স্ত্রী সারা ও বিবি হাজেরা সহ মিসর ত্যাগ করে পথিমধ্যে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ফিনিসিয়া ভ্রমণ করলেন। এই ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিলো ধর্ম প্রচার।

'সাবা' নামক স্থানে এসে তিনি বসবাস শুরু করলেন। তিনি সেখানে কৃষিকাজ ও পশুপালন করতেন। একটি কূপও তিনি সেখানে খনন করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কূপকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে গোলযোগ দেখা দিলো। তিনি এক্ষেত্রেও দারুন সংযমের পরিচয় দিলেন। স্থানীয় বিধর্মীগণ তাঁকে শত্রুজ্ঞান করে সর্বদা ঈর্ষায় জ্বলতো। তারা একসময় জোটবদ্ধ হয়ে কূপটি জোড়পূর্বক দখল করেও নিলো।

এই ঘটনায় ইব্রাহিম আ. দারুন দুঃখিত হলেন। কিন্তু তিনি মনঃকষ্ট মনেই চেপে রেখে একদিন পরিবার পরিজনসহ সাবা ত্যাগ করলেন। কাউকে বিন্দুমাত্র কটুকথা, গালমন্দ কিছুই করলেন না। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী 'কিত' নামক এক শহরে এলেন।

সেখানেও তিনি 'দ্বীনে হানীফের' প্রচার করতে লাগলেন।

এদিকে বিবি সারার মনে অশান্তি দেখা দিল। এতদিন হয়ে গেলো কোনো সন্তানাদি হলো না।

নারীর পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। বিবি সারা নিজের মনেই চিন্তা করলেন, তিনি কখনো হয়তো মা হতে পারবেন না। দিনে দিনে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন এবং তখন থেকেই তিনি অন্যকিছু চিন্তায় নিলেন।

বিবি হাজেরা ছিলেন রূপে গুণে অতুলনীয়া।

সেবা, যত্নে, জীবনাচরণে, মধুর ব্যবহারে বিবি সারা, বিবি হাজেরার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন।

অতঃপর হাজেরাকে বিবাহ করার প্রস্তাব হিসেবে স্বামী ইব্রাহিম আ.কে একদিন তিনি বললেন, আপনি হাজেরাকে বিবাহ করুন।

হজরত ইব্রাহিম আ. প্রস্তাবটি শুনে প্রথমতঃ আপত্তি করলেন। কারণ হাজেরা প্রাপ্তবয়স্কা বুদ্ধিমতী রমণী। তারও তো নিজস্ব একটা মতামত থাকতে পারে।

কিন্তু কার্যতঃ প্রস্তাবিত বিবি হাজেরা বিবাহে আদৌ অমত করলেন না। সম্মতি পেয়ে নবীও অমত করলেন না।

অতঃপর একদিন শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো।

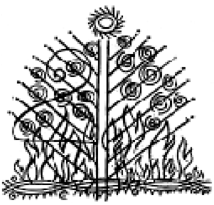

এগারো

সময় বয়ে যাচ্ছে নদীর স্রোতের মতো। পার্থিব সুখের জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। নবী রসূলগণের জীবন তো আরো উর্মিমুখর। এই ঢেউ এর প্রচণ্ডতা কখনো ধীর. কখনো তীব্রতর। জীবনের নানা টানাপোড়েন, আর সুখ-দুঃখের বাস্তবতা, এরই মাঝে একটু স্বস্তি, সুখের একটুখানি পরশ বড়ই মিষ্টি। কিন্তু কতোদিন?

সময়ের পরিক্রমায় বিবি হাজেরা এখন সন্তান সম্ভবা। ইতিপূর্বে হজরত ইব্রাহিম আ. তাঁর বার্দ্ধক্যে এসেও ছিলেন নিঃসন্তান। একদিন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে সন্তান প্রার্থনা করলেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ পুত্র দান করুন। অতঃপর আমি তাকে এক স্থির বুদ্ধি পুত্রের সংবাদ দিলাম।' পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রার্থনা যে কবুল করলেন তা ঐ ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

তওরাতের বর্ণনায়– নবীকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে 'তোমার ঔরসে তোমার উত্তরাধিকারী জন্ম নেবে।' যা হোক বিবি হাজেরা যে সন্তানসম্ভবা'– বিবি সারা যখন এই বিষযটি জানতে পারলেন, সহসা কেনো যেনো তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। 'তারিখে খমিছ'– এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ঈর্ষা সহজাত নয়। বিশেষ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে। সে কথা পরে–।

বিবি হাজেরা ক্রমশঃ বুঝতে পারছিলেন– একটা বড় পরিবর্তন ঘটছে। সে পরিবর্তন বাইরে যেমন, ভেতরে ও তেমনি।

যুগে যুগে নারীরা মা হয়েছে।

তিনিও এই নতুন পরিচয়ে পরিচিত হবেন?

তাঁর অস্তিত্বের উৎসমূলে যে শিশু আসছেন– তারই কারণে এখন বিবি সারার দুচোখের বিষ তিনি? দিন দিন সপত্নীর ঈর্ষার শুলে দীর্ণ হচ্ছে তাঁর হৃদয়। অথচ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা তো ছিলেন বিবি সারা। কি আশ্চর্য, মানুষ এতো বদলে যায়।

দিন দিন বিবি সারার নির্যাতন বৃদ্ধি পেলো। একদিন ক্রুদ্ধতা বশতঃ তিনি বিবি হাজেরার নাক, কান ছিদ্র করে দিলেন। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাওরাতের ষষ্টদশ অধ্যায়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ– 'খোদাবন্দের ফেরেশতা বিবি হাজেরাকে প্রান্তরের মধ্যে এক ঝরণার নিকটে পেলো– অর্থাৎ ঐ ঝরণার নিকটে একটি কুয়ো ছিলো। তখন ফেরেশতা বললো– হে সারার দাসী হাজেরা! তুমি কোথা থেকে এসেছো? এবং কোথায় বা যাচ্ছো? হাজেরা বললো– আমি বিবি সারার সম্মুখ থেকে পালিয়ে এসেছি। ফেরেশতা তখন বললো, তুমি বিবি সারার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁর অনুগত থাকো। এবং আরো বললো, তুমি তো গর্ভবতী। শীঘ্রই একটি পুত্রসন্তান লাভ করবে। তুমি তার নাম রাখবে ইসমাইল।

বিবি হাজেরা যে স্থানে ফেরেশতার সাথে কথোপকথন করেছিলেন সেখানে যে কুয়োটি ছিলো; বিবি হাজেরার স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ সেটার নাম রাখা হয়– 'জীবন্ত দৃশ্যমানের কুয়ো।'

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর শরীরে প্রবলতর হলো ব্যথার কুণ্ডলী। বিবি হাজেরা একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন এবং তাঁর নাম রাখা হলো ইসমাইল।'

তাওরাতে আরো বলা হয়েছে– 'ইসমাইলের জন্মের সময় ইব্রাহিম আ. এর বয়স ছিলো ৮৬ বছর। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করলেন। হে খোদাবন্দ। ইসমাইল যেনো তোমার সমীপে জীবিত থাকে।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর দোয়ার উত্তরে জানালেন 'ইসমাইলের ব্যাপারে আমি তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করেছি। দেখো; আমি কল্যাণ ও বরকত দেবো। তার সন্তান-সন্ততি অনেক বৃদ্ধি করবো, তা থেকে বারোজন নেতা জন্ম নেবে এবং আমি তাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করবো।'

'তারিখে খমিছ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে– যখন হাজেরার সন্তানের কপালে 'নূরে মুহাম্মদী' চমকাচ্ছিলো, তখনই বিবি সারার ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিলো।

বারো

শুরু হলো জীবনের আরেক যুদ্ধ।

এ যুদ্ধ বন্ধন ছিন্ন করার যুদ্ধ।

দাম্পত্য জীবনের প্রেম–প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে নারীর অগ্নিপরীক্ষার আরেক যুদ্ধ।

বিবি সারা ভেবেছিলেন, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সুসংবাদ দেয়া এই সন্তান তারই গর্ভে জন্ম নেবে, কিন্তু যখন দেখলেন– হাজেরার গর্ভে আকাশের চাঁদ সদৃশ এক শিশু জন্মলাভ করেছে, তখনই তাঁর ঈর্ষার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

তারিখে খমিছ–এ আরো উল্লেখ আছে, বিবি সারা তখন তিনটি বিষয়ে হজরত ইব্রাহিম আ.কে হলফ করিয়ে নিলেন।

তার মধ্যে অন্যতম একটি ছিলো, পুত্রসহ হাজেরাকে যেনো নির্বাসন দেয়া হয়। অন্য দুটি ছিলো হাজেরার শরীরের তিন অংশ ছিদ্র করা হয় এবং বিবি হাজেরাকে তারপর থেকে যেনো 'মিনতাক' (এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র) পরিধান করতে দেয়া হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সর্বপ্রথম মহিলা হজরত হাজেরা যাকে 'মিনতাক' পরানো হয়, নাক ও কর্ণচ্ছেদ করা হয়। ফলতঃ হজরত ইব্রাহিম আ. এর হলফ বা ওয়াদা পূর্ণ হলো।

বলাবাহুল্য এই সময় থেকেই কর্ণচ্ছেদ, চুলের খোপা বাঁধা মেয়েদের জন্যে সুন্নতে পরিণত হলো। 'শেফাউল গেরামের' পুস্তকে একথা উল্লেখ আছে অবশ্য।

স্বামীর উপর বিবি সারার ক্রমাগত মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেলো। হাজেরা এবং তার সন্তান ইসমাইলকে তাঁর দৃষ্টির বাইরে রেখে আসতেই হবে।

এতে হজরত ইব্রাহিম আ. অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ এলো বিবি সারার ইচ্ছানুযায়ী বিবি হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে নির্বাসন দিতে হবে এবং সেটা হবে পানিহীন কৃষিহীন এক নির্জন প্রান্তরে এবং এতেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে - - - - ।

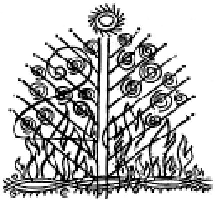

তেরো

অপূর্ব আনুগত্য।

আল্লাহ্তায়ালার হুকুম অলংঘনীয়।

হজরত ইব্রাহিম আ. খলীলুল্লাহ্। তিনি কি আল্লাহ্র অবাধ্য হতে পারেন? খোদায়ী দাবীদার নমরুদের অবাধ্যতা ও পতন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিমধ্যেই।

নমরুদ অদ্ভুত পরিকল্পনা নিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার হাস্যকর প্রচেষ্টা নিয়েছিলো সে। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রহসনও করেছিলো। বার বার দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে নমরুদকে হেদায়েত করা যায়নি।

পাপিষ্ঠ নমরুদ আল্লাহ্কে হত্যা করার হাস্যকর খেলায় মেতে উঠে নিজেই সদলবলে ধ্বংস হয়ে গেলো। হজরত ইব্রাহিম আ. এসব ঘটনালীকে নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করলেন। অনেক জ্ঞানের নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করলেন।

অবশ্য বাতেলের এটাই ছিলো অনিবার্য পরিণতি। কোরআন মজীদে আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন– 'যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে থাকে– রাখো! পৌরানিক কেচ্ছা-কাহিনী। কক্ষোনো নয়– বরং তাদের অপকর্মসমূহ রঞ্জিত হয়ে তাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে।' নমরুদের এবং তার দোসরদের ক্ষেত্রেও তাই সত্য হয়েছিলো।

এক্ষেত্রে নমরুদের 'রাইনী হিজাব' প্রধান অন্তরায় ছিলো। 'রাইনী হিজাব' এক প্রকার সুদৃঢ় অন্তরায়– যা কখনো অপসারণ হয় না। কারণ অন্তরে তা একবার সম্পৃক্ত হয়ে যাবার পর সিল পড়ে স্থায়ী দাগ হয়ে যায়। নমরুদ বা তার অনুসারীদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো। পবিত্র কোরআনের অমোঘবাণী 'আল্লাহ্তায়ালা সীমা লংঘনকারীকে কক্ষোনো বরদাশ্ত করেন না।' হজরত ইব্রাহিম আ. তাও জানতেন।

অতএব হজরত ইব্রাহিম আ. সদাসর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। আল্লাহ্র আদেশের প্রতি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও আল্লাহ্র বন্ধুত্বের পরিচয় প্রদান করতে তিনি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সুদৃঢ় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছিলেন।

অতঃপর তিনি বিবি হাজেরাকে বললেন, হে হাজেরা। পুত্র সহ প্রস্তুত হও। স্থানান্তরে চলে যেতে হবে।

চৌদ্দ

এখানেও অপূর্ব আনুগত্য।

বিবি হাজেরা কোনোরূপ প্রশ্ন তোলেননি। কোথায় যেতে হবে? কেনো যেতে হবে? এরকম কোনো কথাই বলেননি।

'কাবা শরীফের ইতিহাস' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে– 'হজরত ইব্রাহিম আ. বিবি হাজেরা ও তাঁহার পুত্রকে নির্বাসনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিলে তাঁহাদের জন্য এক ঐশী বিদ্যুৎবাহী বাহন বা বোরাক আনা হইলে সকলে উহাতে আরোহণ করিলেন। হজরত জিব্রাইল আ. তাহাদিগকে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে পথ নির্দেশ করিতে লাগিলেন। তিনি কাবা গৃহের ও হারাম শরীফের সীমানার চিহ্নগুলি পরিচিত করিতে করিতে মক্কা শরীফে পৌঁছিলেন–।'

এদিকে ঐতিহাসিক মুজাহিদী হতে বর্ণিত আছে 'যখন হজরত ইব্রাহিম আ. বিবি হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে নিয়ে নির্বাসনের জন্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন সফিনা ও ছুরত তথায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। সফিনা বলেছিলো, হে ইব্রাহিম! আমি সব সময় বায়তুল্লাহ্‌র উপর অবস্থান করতে থাকবো।'

কথিত আছে– সফিনা একটি ঘনীভুত বাতাস বিশিষ্ট প্রাণী। তার জিহ্বা আছে এবং দেখতে অনেকটা সাপের মতো।

ইমাম আজরফি বলেছেন যে– 'হজরত আলী রা. বলেন, হজরত ইব্রাহিম আ. সফিনা ও ছুরত পাখি সহ মক্কা শরীফে আগমন করেছিলেন। ছুরত পাখি ছিলো কবুতরের মতো। তারা হারাম শরীফে আশ্রয় নিয়েছিলো। তারা কথা বলতো। ছুরত পাখিদের গায়ের রঙ ছিলো মেঘ-রঙ।

ছুরত পাখি বলেছিলো– হে আল্লাহ্‌র খলীল। আপনি আমার নির্দেশিত ও চিহ্নিত সীমারেখা পথে অগ্রসর হোন এবং কাবার ন্যায়ারের মাটি খনন করুন। এই চিহ্নের কেউ কমবেশী করতে পারবে না। অতঃপর হজরত ইব্রাহিম আ. তাই করেছিলেন–।'

ইমাম বাগবীর 'তফসিরে মেয়োল্লিমু তনজিল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– 'এই সফিনা কাবা গৃহের ভিতের উপর ঘুরে ঘুরে চারদিকের সীমানা নির্দেশ করেছিলো।'

আবার কোনো কোনো গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন– হজরত ইব্রাহিম আ. আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেয়ে কাল বিলম্ব না করে বিবি হাজেরা ও শিশু ইসামইলকে এক উটে ও তিনি একাকী অন্য একটি উটে আরোহণ করে প্রাণপ্রিয় পুত্র ও স্ত্রীকে নির্বাসনের জন্যে রওনা হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা মক্কার তরুলতাহীন, পানিহীন মরুভূমির বায়তুল্লাহ্‌ নামক স্থানে পৌঁছলেন।

বর্ণনার ভিন্নতা যাই হোক– আমরা বিতর্কে না গিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা জ্ঞানময়, তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত; সবকিছুই তাঁরই নির্দেশনায় সংঘটিত হয়ে থাকে– একথা স্মরণে রেখে বরং এবার দেখি হজরত ইব্রাহিম আ. কোথায় এবং কিভাবে বিবি হাজেরাকে এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় শিশুপুত্রকে রেখে এলেন।

সত্যি এ যে জনমানবহীন শূন্য প্রান্তর।

খাঁ–খাঁ ক্ষেত কৃষিহীন, পানিহীন আশ্রয়।

অদূরে দুটি রহস্যময় পাহাড় নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তিনি একটি স্থানে ছোট বস্ত্রাবাস তৈরী করে মাতা ও পুত্রকে সেই জনমানবহীন প্রান্তরে রেখে প্রত্যাবর্তন করার উদ্যোগ নিলেন। এক মশক পানি ও কিছু খেজুর মাত্র তাঁদের আহার্য হিসেবে রেখে, তিনি অসময় যাত্রা শুরু করলেন। যদিও স্ত্রী পুত্রের বিরহে তিনি মরমে মর্মাহত; তবু দ্রুত সেখান থেকে তিনি ফিরে চললেন।

পুত্রকে রেখে বিবি হাজেরাও কিছুদূর পর্যন্ত স্বামীকে অনুসরণ করে অগ্রসর হলেন। এক সময় স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই নির্জন প্রান্তরে কার কাছে তাদেরকে রেখে যাচ্ছেন তিনি? এখানে না আছে মানুষজন না আছে খাদ্য – –।

হজরত ইব্রাহিম নিশ্চুপ। উত্তরহীন।

–এটাই কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ? পুনঃ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন বিবি হাজেরা।

–হ্যাঁ হাজেরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ।

–তাহলে আমার আর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। তিনি, বিবি হাজেরা অতঃপর পুত্রের কাছে ফিরে এলেন।

উট ফিরে চলেছে।

হজরত ইব্রাহিম আ. কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি স্থানে এসে (বর্তমান কাবা শরীফ যেখানে) উট থেকে অবতরণ করলেন এবং হাঁটু গেড়ে আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করলেনঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয়ই আমি আমার বংশধরগণকে আপনার পবিত্র গৃহের নিকটবর্তী ফল মূলহীন প্রান্তরে সংস্থাপিত করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তাঁরা যেনো সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, অতএব আপনি মানবমণ্ডলীর অন্তরসমূহকে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাঁদেরকে ফলপুঞ্জের দ্বারা জীবিকা দান করুন, যেনো তাঁরা কৃতজ্ঞ হয়। (সুরা ইব্রাহিম)

এই প্রার্থনা কবুলের ফলস্বরূপ হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। এরই বরকতে কি তায়েফ প্রদেশে সকল ঋতুতে আজো প্রচুর ফলমূল উৎপন্ন হয়? বাস্তবিক এখনো ফল ও গোশত্ এখানকার অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান জীবিকা।

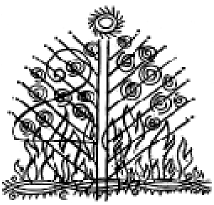

পনেরো

মরুর বুকে মাত্র দু'টি প্রাণের স্পন্দন। এই স্পন্দন ছিলো বড়ই নিস্তরঙ্গ। বড়ই ক্ষীণ। আশে পাশে বৃক্ষ নেই। ছায়া নেই– কায়া নেই। চার পাশে আছে সীমাহীন নৈঃশব্দ। আর অদূরে রহস্যময় সেই দু'টি পাহাড়।

বিবি হাজেরার দিন কাটে বড় নিরানন্দভাবে। কয়েকদিন পর্যন্ত পাত্রের পানি এবং সেই কিছু খেজুর অল্প অল্প করে খেলেন। ইসমাইলকে তিনি স্তনের দুধ খাওয়াতেন। কিন্তু এমন মুহূর্ত এলো যখন না আছে পানি না আছে খেজুর। তিনি খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজে তো ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত। তার জন্যে ভীত নন তিনি। ভীত হলেন হঠাৎ করে স্বীয় বুকের দুধ শুকিয়ে গেলো দেখতে পেয়ে।

যে শিশু আপন মনে খেলতো, হাসতো। তার মুখে এখন কি তুলে দেবেন তিনি?

অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে লাগলো। শিশু ইসমাইল ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়লেন। লাগাতার কেঁদেই চলেছেন তিনি। বিবি হাজেরা এখন উদভ্রান্ত। কিভাবে প্রাণপ্রিয় শিশুর জীবনটি রক্ষা হবে?

কেঁদে কেঁদে শিশুর কণ্ঠ তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো। বিবি হাজেরা আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। সহসা দৃষ্টি পড়লো নিকটস্থ সাফা পাহাড়টির দিকে। তিনি পুত্রকে সেখানেই রেখে ছুটলেন সাফা পাহাড়ের দিকে। কি যেনো পানির মতো চিক মিক করছে সেখানে। কিন্তু না, পৌঁছে দেখতে পেলেন পানি নয়।

সন্তানের আর্কষণে দৌড়ে উপত্যকায় নেমে এলেন। সেখান থেকে দেখতে পেলেন অপর পাহাড়টির গা বেয়ে পানির ঝরণার মতো স্রোত ধারা। ছুটলেন তিনি। কিন্তু পানি কোথায়? পৌঁছে দেখতে পেলেন বিবি হাজেরা লেশমাত্র পানির চিহ্ন নেই সেখানেও।

অতঃপর দ্রুতবেগে আবার উপত্যকায় নেমে এলেন শিশুর কাছে। এভাবে সাতবার উঠা নামা করলেন বিবি হাজেরা।

একদা হজরত মোহাম্মদ স. এই স্থানে এসে বলেছিলেন, এটাই হচ্ছে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী দৌড়, যা হজ্জের সময় লোকেরা করে থাকে।

শেষ পর্যন্ত যখন বিবি হাজেরা মারওয়ার উপরে ছিলেন, তখন সহসা কানে একটি শব্দ এলো। তিনি চমকে উঠলেন। এবং মনে মনে ভাবলেন, কেউ কি ডাকছেন তাকে? তিনি উৎকর্ণ হলেন সেই শব্দের উৎস শুনবার জন্যে। আবার একই শব্দ কানে এলো। এবার তিনি সত্যিই দেখতে পেলেন ইসমাইলের নিকটে একজন জ্যোর্তিময় পুরুষ দণ্ডায়মান।

পুত্রের কাছে এসে আরো দেখতে পেলেন অবাক কাণ্ড। কঠিন পাথরের বুক চিরে মধুর নিনাদে এক খরস্রোতা নহর বয়ে যাচ্ছে ইসমাইলের পদপাশ থেকেই। বিবি হাজেরা খুবই দ্রুততায় 'যম যম' শব্দ উচ্চারণ করলেন এবং হাত দ্বারা পাথরের বাঁধ দিয়ে পানিকে আবদ্ধ করলেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় উল্লেখ আছেঃ এই স্থানে পৌঁছে নবীয়ে করিম স. একদা বলেছিলেন 'আল্লাহ্ ইসমাইলের মাতাকে কৃপা করুন। যদি তিনি 'যম যম' শব্দ না করতেন এবং যমযমের চারদিকে বাঁধ দিয়ে এইভাবে পানি আবদ্ধ না করতেন, তাহলে আজ এটা একটা বিরাট প্রস্রবণ হতো।

বিবি হাজেরা অতঃপর পানি পান করলেন। এবং ইসমাইলকে স্তন দিলেন।

সেই জ্যোর্তিময় পুরুষটি ছিলেন আল্লাহ্র ফেরেশতা হজরত জিব্রাইল আ.। তিনি বিবি হাজেরাকে অন্তরাল থেকে অভয় দিলেন। বললেন, কোনো ভয় বা চিন্তা করবেন না, এই স্থানটি বায়তুল্লাহ্– যা নির্মাণের সৌভাগ্য এই শিশুটির এবং তার পিতার। এটা আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্ধারিত। তাই এই বংশকে রক্ষা করা হবে। এ ধরনের কিছু কথাবার্তা বলে আল্লাহ্র ফেরেশতা অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

বায়তুল্লাহ্র স্থানটি ছিলো একটু উঁচু। কিন্তু বন্যার পানি ডান ও বাম দিক থেকে এটাকে একাকার করে দিতো। যাহোক– বিবি হাজেরা ও শিশু পুত্রের কিছুদিন এভাবেই কেটে গেলো। আবার ফিরে এলো নিঃসঙ্গতা বোধ। একটা অপোগণ্ড শিশুকে নিয়ে তিনি একা। কিন্তু না, খুব শীঘ্রই একাকীত্ব কেটে গেলো– আল্লাহ্র মেহেরবানিতে। পানির উৎসের সন্ধানে কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে এলো। পানির ছোঁয়া পেয়ে চারপাশটা কেমন শ্যামলে সুবজে ঘন কুঞ্জবনে ঢেকে যাচ্ছিলো। এখন পাখিডাকা–ছায়া ঢাকা স্নিগ্ধ নির্জন জায়গাটা।

কিন্তু নির্জনতা থাকলো না। একদিন জুরহাম গোত্রের কতিপয় লোকেরা এই প্রান্তরের নিকটে এসে থেমে পড়লো অদ্ভুত ও অলৌকিভাবে। তারা দেখতে পেয়েছিলো– দূরে ঝাকে ঝাকে পাখি উড়ছে। দেখেই তারা মনে মনে ভেবেছিলো, নিশ্চয়ই এরই ধারে কাছে কোথাও পানি আছে। বাস্তবিক তাই। যমযম কূপের

পানি দেখতে পেলে তৃষ্ণার্ত জুরহামেরা তৃষ্ণা নিবারণের পানি চাইলো বিবি হাজেরার কাছে। বিবি হাজেরা পানি পান করবার অনুমতি দিলেন। জুরহামেরা সুশীতল পানি পান করে অতিশয় তৃপ্ত হলো এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো। অনেক দিক ভেবেচিন্তে এই স্থানে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্যে তারা বিবি হাজেরার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলো।

বিবি হাজেরা বললেন– থাকতে পারো। তবে পানির মালিকানায় অংশীদার হতে পারবে না। জুরহামেরা সে কথা সানন্দে মনে নিলো এবং সেখানেই থেকে গেলো।

রসুলুল্লাহ স. বলেন, বিবি হাজেরাও পরস্পর সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের খাতিরে চাচ্ছিলেন এখানে কেউ না কেউ এসে বসবাস করুক। তাই তিনি জুরহাম গোত্রকে অনুমতি দেন।

পরবর্তী সময়ে জুরহাম গোত্রের লোকেরা তাদের গোত্রের বাকী লোককেও এখানে নিয়ে আসে এবং ঘর বাড়ী তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তাদের মাঝেই ইসমাইল আ. সময় কাটাতেন, খেলাধুলা করতেন। তাদের কাছে ভাষা শিক্ষা করতেন।

অনুর্বর মরুপ্রান্তরে তখন জনবসতি বৃক্ষলতা ফুল পাখি ফসলের ক্ষেত। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ও হতো। পানি যেতো, দুধ ও শস্যাদি আসতো। এই ভাবেই সুন্দর সৌহার্দ গড়ে উঠলো নিজেদের মধ্যে। শুধু সৌহার্দ নয়। ইসমাইল আ. যখন যুবক হলেন, তখন এই গোত্রেই তিনি প্রথম বিবাহ করেন। কিন্তু সেতো পরের কথা। এর আগে তো অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

ক্রমশঃ দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য বনিকের আনা গোনা শুরু হলো সেখানে। রপ্তানি আমদানির বানিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হলো একদিন এই জনপদ।

এইভাবেই বিশ্ব মুসলিমের মিলন কেন্দ্র পবিত্র মক্কা নগরীর পত্তন হলো।

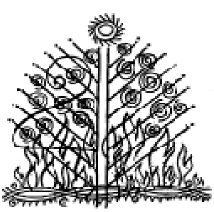

ষোল

হজরত ইব্রাহিম আ. বিবি হাজেরাকে, শিশু ইসমাইলকে মক্কার নির্জন ক্ষেত কৃষিহীন পানিহীন প্রান্তরে নির্বাসন দিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি তো আসলে ছিলেন একজন স্নেহময় পিতা এবং সর্বোপরি একজন মহান নবী। এমতাবস্থায় তিনি কি করে নির্বিকার থাকতে পারেন?

এর মধ্যে সময় ক্ষয়ে গেছে অনেক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হজরত ইব্রাহিম আ. ইতিমধ্যে মক্কায় এসেছিলেন বটে। কিন্তু অবস্থান করেননি। বিবি হাজেরাকে শিশু পুত্রকে দেখা দেননি। কারণ একটাই, বিবি সারার কছে তিনি এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন।

এদিকে বিবি হাজেরার মনে সুখ ছিলো না। দীর্ঘ সাতটি বছর ধরে স্বামীকে দেখেননি তিনি। শিশুপুত্র ইসমাইল এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছেন। পিতা সম্পর্কে তাঁর নানান প্রশ্ন। সে সব প্রশ্ন শুনে মা–হাজেরা, মাঝে মাঝে খুবই বিব্রত বোধ করেন। মাঝে মাঝে খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়েন। আজ কতো কিছু বদলে গেছে, বদলে গেছে স্থান, প্রকৃতি। বদলে গেছে ইসমাইলের বয়েস। কিন্তু মন?

মন তো এতটুকু বদলায়নি বিবি হাজেরার। মন যে এখনো সর্বক্ষণ হাহাকার করে তারই জন্যে। সেই মহান নবীর জন্য। সেই প্রিয়তম স্বামীর জন্য।

একদিন দ্বিপ্রহর।

বিবি হাজেরা নিত্যকার অভ্যাসবশতঃ দূর পথপানে চেয়ে আছেন। ইদানীং কেনো যেনো স্বামীর দর্শন আকাঙ্খায় হৃদয়-মন তাঁর অধীর–উতলা হয়ে উঠেছে।

দূরে–বহুদূরে কি দেখা যায় ও। বালুকারাশির মধ্যে অস্পষ্ট চলমান একটি বিন্দুর মতো কে যেনো এগিয়ে আসছেন– তিনি দেখতে পেলেন।

দিগন্তহীন বালুকারাশি। উত্তপ্ত লু-হাওয়া। সেই রৌদ্রদগ্ধ পথের দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন। অজান্তেই মন বলে উঠলো– সত্যি কি তিনিই?

হ্যাঁ, উষ্ট্রারোহী একজন আগন্তুক সন্দেহ নেই। ক্রমশঃ এদিকেই এগিয়ে আসছেন। অত্যন্ত সতর্ক আর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি। সহসা তাঁর উৎসুক চোখে ফুটে উঠলো উজ্জ্বল আশার আলোক। মনে হলো– তিনি যেনো মুহূর্তে আনন্দ বিহবলে স্থবির হয়ে গেলেন। যেনো সবকিছুই পেয়েছেন। হ্যাঁ, তিনিই তো এলেন–।

আপন গৃহ হতে দ্রুত বের হলেন বিবি হাজেরা। স্থান কাল পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা কোনো দিকে –লক্ষ্য নেই। একপ্রকার দৌড়েই এগিয়ে গেলেন তিনি। একসময় উটের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। উভয়েই উভয়ের দিকে পলকহীন চেয়ে রইলেন। মুখে ভাষা নেই। যেনো মোহাবিশিষ্ট দুজনেই। স্বামীকে পলকহীন পরখ করে দেখতে দেখতে বিবি হাজেরার ওষ্ঠ দুটি এক সময় বেতসলতার মতো থর থর করে কেঁপে উঠলো। কথাহীন বিবি হাজেরার দুচোখে ছাপিয়ে সহসা অশ্রুর বন্যা নামলো এবং ঐ অশ্রুভেজা চোখে প্রিয়তম স্বামীর উটের রশিটি ধরলেন তিনি।

উট ধীরে এগিয়ে চলেছে।

হজরত ইব্রাহিম আ. চারদিকে চেয়ে চেয়ে বড় আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। এই কি সেই জনমানবহীন মরু প্রান্তর? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন আল্লাহ্‌র অপার রহস্যময়তা দেখে। মনে মনে শোকর গুজার হলেন মহান স্রষ্টার প্রতি। প্রসন্ন হয়ে উঠলো তাঁর মুখমণ্ডল।

একসময় একটি স্থানে এসে উট থেমে গেলো।

সম্মুখে একখানা পর্ণ কুটির দেখা গেলো।

বিবি হাজেরা বললেন, আসুন খলিলুল্লাহ।– এই তো আপনার দাসীর কুটির।

প্রসন্ন মুখ সহসা বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠলো নবীর। হজরত ইব্রাহিম বললেন–আমি দুঃখিত হাজেরা। তোমার গৃহে অবতরণ করতে আমি অক্ষম।

– কেনো–হজরত?

– আমি যে সারার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তোমার বাস্তুর মৃত্তিকায় আমি পদস্থাপন করতে পারবো না হাজেরা।

–ওঃ বুক চিরে যেনো একটা আবদ্ধ বাতাস সহসা বেরিয়ে গেলো বিবি হাজেরার ঐ একটি মাত্র শব্দে। হজরত ইব্রাহিম আ. পুনঃ বললেন– ইসমাইল কোথায়? আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র চোখে দেখে দোয়া করে চলে যাবো।

ঠিক সেই সময় বালক ইসমাইল আ. কোত্থেকে দৌড়ে এলেন সেখানে। এসেই মায়ের আঁচল ধরে সলজ্জভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন– আম্মী; ইনি কে?

বিবি হাজেরা পুত্রকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুচোখে ছুটে এলো সেই অবাধ্য পানি। চোখ মুছলেন তিনি। তারপর বললেন– ইসমাইল। যাঁর সম্বন্ধে তুমি অহরহ আমাকে প্রশ্ন করো– ইনি তোমার সেই পিতাজী!

পিতাজী! বিস্ময়বিমুগ্ধ বালক ইসমাইলের দৃষ্টি। মায়ের কোল ছেড়ে দ্রুত নেমে ছুটে গেলেন পিতার দিকে কচি দুটি হাতে পিতাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই মুহূর্তে হজরত ইব্রাহিম আ.ও পিতৃস্নেহে পুর্ণনিমজ্জিত। স্নেহ–আবেগে পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এ–যে মহামিলনের ক্ষণ।

কিন্তু বড় সংকীর্ণ এই ক্ষণ। শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়।

তাঁরা পরস্পর পরস্পরের হৃৎপিণ্ডের শব্দ পড়তে চাইলেন যেনো। কিন্তু সময় যে বেশী নেই।

ঊর্ধ্বে সীমাহীন নীলাকাশ।

আর সেই মুহূর্তকার অনন্ত নৈঃশব্দে; পরস্পর এক নতুন জগতকে যেনো খুঁজে ফিরছেন নবী পরিবারের এই তিন প্রাণী।

হৃদয় দীর্ণ হচ্ছে, তবু তো বলতে হবে বিদায়ের কথা। শেষ বার চুম্বন করে পুত্রকে নামিয়ে দিয়ে বললেন নবী ইব্রাহিম– চলি তবে হাজেরা। ইনশাল্লাহ্ আবার সাক্ষাৎ হবে।

মুহূর্তে আবার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রু গড়িয়ে এলো বিবি হাজেরার। বুকখানা ফেটে যাবে তাঁর। তিনি বায়ুরুদ্ধ স্বরে– বললেন–প্রিয়তম! আপনার প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ করবো না–শুধু আমার একটা অনুরোধ রাখতে মিনতি করি।

–বলো।

–আপনার অনুমতি পেলে–দু'খানা পাথর এনে দিচ্ছি– তার উপর দাঁড়ান আপনি এবং আমাকে সামান্য খেদমত করার সুযোগ দিন।

–আচ্ছা বেশ তাই হবে। মঞ্জুর হলো অনুরোধ। ওদিকে তাঁর প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা হলো।

বিবি হাজেরা জমজমের পবিত্র পানি তুলে এনে স্বামীর পবিত্র কদম মোবারক ধৌত করে দিলেন। স্বীয় মাথার চুল দিয়ে স্বামীর পা মুছে দিলেন। গৃহ থেকে সুস্বাদু ফল–ফলাদি ও দুধ এনে স্বামীকে খেতে দিলেন।

বিবি হাজেরার অন্তরঙ্গ খেদমত গ্রহণ করে এবং ফল ও দুধ আহার করে যমযমের পানি পান করে নবীও পরম তৃপ্তিলাভ করলেন। আল্লাহ্র অশেষ শোকরিয়া আদায় করে স্বীয় পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করলেন। এরপর থেকেই তিনি মাঝে মাঝে এসে স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে ও বিবি হাজেরাকে দেখা সাক্ষাৎ দিয়ে যেতেন।

যে পাথর দু'খানায় হজরত ইব্রাহিম আ. পা রেখে অবতরণ করেছিলেন, বিবি হাজেরা পরম যত্নে সে পাথর দুটি উঠিয়ে রাখলেন নিজ ঘরে। কালক্রমে সেই পাথর খানায়ে কাবার একটি দ্বারে রক্ষিত হয়। এবং আজ সেই পাথরটিই 'মাকামে 'ইব্রাহিম' নামে কোটি কোটি মুসলমানের চুম্বনের আধার।

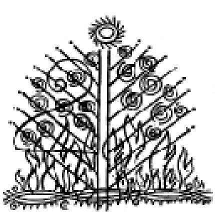

সতেরো

দিন গড়িয়ে গেলো। বছর পেরিয়ে গেলো। ক্রমে ক্রমে জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠলো। এলো জিলহজ্ব মাস।

এই মাসের আট তারিখের এক নিস্তব্ধ গভীর নিশিথ। নবী বিবি হাজেরার গৃহে নিদ্রিত।

হালকা নিদ্রার মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নটা এমন অদ্ভুত। হঠাৎ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। কিন্তু তখনো যেনো স্বপ্নের সেই বাণী তাঁর কর্ণকুহরে অনুরণিত হচ্ছিলো– হে ইব্রাহিম! তুমি আমার নামে কোরবানী করো।

তিনি প্রত্যুষে উঠে দরিদ্রদের মধ্যে অজস্র দান খয়রাত করলেন। কোরবানী দিলেন।

দ্বিতীয় রাত্রে একই স্বপ্ন।

পরদিন তিনি একশত দুম্বা ও উট কোরবানী করে বিলিয়ে দিলেন।

তৃতীয় রাত্রে আরো কঠিনভাবে এবং স্পষ্ট ইঙ্গিতে আদেশ হলো– হে ইব্রাহিম! তুমি আমার উদ্দেশ্যে তোমার প্রিয়তম সন্তান ইসমাইলকে কোরবানী করো।

নবীদের সব স্বপ্ন সত্য। অহীয়ে ইলাহীর মর্যাদাভুক্ত।

হজরত নবী করীম স. বলেছেন, 'নবীদেরকে আপন আপন মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার মধ্যে পতিত করা হয়ে থাকে'। হজরত ইব্রাহিম আ. ছিলেন উচ্চ মর্যাদাশীল নবী। তাই তাঁকে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়েছে বারবার। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে উত্তীর্ণও হয়েছিলেন।

নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি ছিলেন পরম সহিষ্ণু। প্রিয়তম স্ত্রী হাজেরাকে শিশুপুত্র ইসমাইল সহ ফারানের প্রান্তরে নির্বাসিত করেও ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি।

কিন্তু এক্ষণে যে আরো কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষা। স্বপ্ন দেখে ধড় ফড় করে শয্যায় উঠে বসলেন হজরত ইব্রাহিম আ.। হৃদয় মন দেহ তখনো থর থর করে কাঁপছে তাঁর। অবিরাম ঘাম নির্গত হচ্ছে। তবু তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন এক সময়।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তিনি এর চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেও প্রস্তুত। দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে মনে মনে তৈরী হয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু বিষয়টি শুধু তাঁর সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো না। বরং এর অপর অংশ ছিলো প্রাণপ্রিয় পুত্র; যাকে সরাসরি কোরবানী করার হুকুম দেয়া হয়েছিলো।

অতএব, পিতা পুত্রকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত এবং আল্লাহ্‌র হুকুম শুনালেন।

পুত্রও তো ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। তিনিও সত্যাশ্রয়ী এবং নবী ও রসুল।

তিনি অবনতমস্তকে আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে নিলেন। পিতাকে বললেন, যদি এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, তাহলে ইনশাল্লাহ্‌ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন। হজরত ইব্রাহিম আ. এবার কতকটা নিশ্চিত হলেন।

শুরু হলো আয়োজন।

কিন্তু ইবলীশের দেহে যেনো আগুন ধরে গেলো। সে ভেবেছিলো হজরত ইব্রাহিম আ. যদি স্বীয় পুত্রকে সত্যি সত্যি কোরবানী দেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট আরও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবেন তিনি। মনঃজ্বালা ছিলো তার। বনী আদম আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হলে যে সে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যায়।

হজরত ইব্রাহিম আ. বালক ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে একদা যখন মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, ইবলীশ শয়তান পেছন থেকেই ইসমাইল আ.কে দাগা দিতে শুরু করলো।

জুমুরাতুল উস্তার নিকটে শয়তান পুনঃদৃষ্টিগোচর হলো এবং শেষবার জুমুরাত ছোফলার নিকটে ইবলীশ শয়তান এসে দাগা দিলো। প্রতিবারই শয়তানের উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।

মিনার নির্জন প্রান্তরে পৌঁছে, পিতা ইব্রাহিম, ইসমাইলের সম্মতি পেয়ে তাঁকে কোরবানীর পশুর মতো শক্ত করে বাঁধলেন। শানিত ছুরি নিয়ে কোরবানী করতে উদ্যত হয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করলেন–

'হে প্রভু! আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, সবকিছুই আপনার উদ্দেশ্যে। হে আমার আল্লাহ্‌! আপনি অনুগ্রহ করে আমার কোরবানী কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সব কিছুই শ্রবণ করে থাকেন।'

ইতিমধ্যে পুত্র ইসমাইলকে উপুড় করে শুইয়ে ফেলা হয়েছে। শানিত ছুরিও উদ্যত হলো এরপর। কিন্তু না।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মানুষের রক্ত নয়।

মানুষের শরীরী কোরবানী নয়।

স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা দিলেন 'হে ইব্রাহিম। তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যসত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিলো একটা স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে কোরবানীর জন্য এক হৃষ্টপুষ্ট জন্তু দিলাম। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি ....।' (সুরা আস সাফফাত)।

হজরত ইব্রাহিম আ. পেছনে তাকিয়ে দেখলেন, একটি সুন্দর কোরবানীর পশু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন এবং ঐ হালাল পশুটিকে যবেহ করলেন। এটিই হলো কোরবানী।

কোরবানীর পশুর রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছায় মানুষের নিয়ত, তার আত্মত্যাগ, তার পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাব। এই কোরবানীই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছিলো, যা আজো মিল্লাতে ইব্রাহিমের আদর্শব্রতে পরিণত হয়ে আছে এবং আজো সমগ্র ইসলামী বিশ্বে জিলহজ্বের দশ তারিখে এই ব্রতটি পালিত হয়।

আঠারো

নির্জন মরুপ্রান্তর এখন জনপদ। জনমানবের কলগুঞ্জনে মুখর। পাখি ডাকে। পানির পরশে প্রান্তর সবুজ হয়। হজরত ইব্রাহিম ফিরে গেছেন সিরিয়ায়। এখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ইসলাম প্রচার করছেন।

এদিকে বিবি হাজেরা পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে জুরহাম গোত্রের মাঝে বিরহী–জীবন যাত্রা পালন করছেন।

বিবি হাজেরার ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহ্‌র উপর তাঁর পরম নির্ভরশীলতার অপূর্ব নিদর্শন ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। খাদ্য ও পানীয়বিহীন নির্জন মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত হয়ে তিনি নিজে যেমন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তেমনি মানবকুলের জন্যে আল্লাহ্‌র দেয়া–অফুরন্ত রহমতের উৎস আবে যমযম এর এক অপার নিগুঢ় রহস্যের উন্মোচন করে দিলেন। কারণ, বায়তুল্লাহ্‌র আবাদ এভাবেই শুরু হয়েছিলো।

একদা হজরত ইব্রাহিম আ. আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন "হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে শান্তিপূর্ণ ও আমার বংশধরদিগকে মূর্তিপূজা করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন"...।

আল্লাহ্‌তায়ালা প্রিয় খলীলকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন– "হে ইব্রাহিম! আমি আপনার এবং আপনার পূর্ব– পুরুষগণের প্রতিপালক। আপনাকে আমি প্রাচুর্যে ভরে দেবো আপনি হবেন জাতির পিতা। আপনার বংশাবলীকে কেনানের সমগ্র ভুখণ্ড প্রদান করবো– তাদের বংশধরগণ তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে এবং আপনার পুত্র ইসমাইল নিশ্চয় প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্গত একজন– তাকে আমি বিশেষ কল্যাণ ও অশেষ সম্মানের অধিকারী করবো"....ইত্যাদি।

এই পুত্র ইসমাইল আ.ও ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। তিনি ছিলেন রসুল, নবী। তিনি পরিজনকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন– না–শোকর রমণী। একদা হজরত ইব্রাহিম আ. তার সঙ্গে কথপোকথনে তা বুঝতে পেরে স্বীয় পুত্রের উদ্দেশ্যে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন, 'ঘরের চৌকাঠ যেনো বদলে ফেলা হয়। এ কথায় ছিলো পরিত্যাগের স্পষ্ট ইঙ্গিত। অথচ দ্বিতীয় স্ত্রী সম্পর্কে উল্টো নির্দেশ ছিলো। কারণ হজরত ইসমাইল আ. এর দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন শোকরগুজার আল্লাহ্‌ভক্ত মহিলা। হজরত ইব্রাহিম আ. এই পুত্রবধুর সঙ্গে কথোপকথনে সেটা বুঝতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই দ্বিতীয় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ নির্দেশ প্রদান করে গিয়েছিলেন– 'ঘরের চৌকাঠ যেনো বহাল রাখা হয়।'

বহুদিন পর এবার পিতা ইব্রাহিম আ. অন্য রকম নির্দেশ নিয়ে এলেন। ইসমাইল আ. একটা কাজে সেদিন ব্যস্ত ছিলেন। পিতার আগমনবার্তা তিনি আগে থেকে জানতেন না। পিতা এলেন আকস্মিকভাবে এবং এসে বললেন– হে ইসমাইল। আমি একখানা গৃহনির্মাণ করবো– আল্লাহর ইবাদতের জন্যে– এ বিষয়ে আমি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আদিষ্ট হয়েছি–।

হজরত ইসমাইল সাগ্রহে পিতাকে সম্ভাষণ জানালেন এবং বললেন আমি অবশ্যই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবো। কিন্তু স্থানটি কোথায় হবে?

হাফিজ ইবনে আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থে এই মর্মে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। বর্ণনাটি এমন– হজরত আদম আ. এর হাতেই সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ্‌র ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো। আর আল্লাহ্‌র ফেরেশতা সেই স্থানটি চিহ্নিত করে দেন– কোথায় কা'বা নির্মিত হবে। হাজার হাজার বছরের প্রাকৃতিক পরিবতর্ন আদম আ. এর তৈরী সেই কা'বাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিলেও– তখনও তা একটি টিলা বা ভিটার আকারে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করছিলো।

হ্যাঁ, এটাই সেই স্থান।

'অহীয়ে ইলাহী–র' মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিম আ. পুত্রকে চিহ্নিত করে দিলেন স্থানটি।

শুরু হয়ে গেলো খোঁড়া খুঁড়ি।

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রাচীন কালের সেই ভিত্তিটাই বেরিয়ে পড়লো।

হজরত ইব্রাহি আ. ইসমাইল আ. এর সহযোগিতায় সেই প্রাচীন ভিত্তির উপরই নতুন করে ভিত্তি স্থাপন করলেন।

পিতাপুত্র লাগাতার কাজ করে চলেছেন। যখন দেয়াল কিছুটা উপরে উঠে গেলো এবং সেখানে কাজ করা পিতা ইব্রাহিমের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়লো, তখন আল্লাহ্‌রই ইঙ্গিতে একটি পাথর আনা হলো। এটিকে সিঁড়ি বানানো হলো। এর

উপর দাঁড়িয়ে হজরত ইব্রাহিম নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন। এটাই সেই স্মরণীয় স্থান যা-আজ 'মাকামে ইব্রাহিম' নামে খ্যাত।

চুন ও মাটি ব্যতিরেকে পাথরের উপর পাথর বসিয়ে কা'বা গৃহের দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হচ্ছিলো। কথিত আছে, এই কা'বা গৃহ একটি লাল পাথরের স্তুপের উপর তৈরী হয়েছিলো। প্লাবনের পানি গৃহের উত্তর দক্ষিণ পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতো কাবা গৃহের কোনো ছাদ ছিলো না এবং গৃহের দরজা ছিলো খোলা।

হজরত আদম আ. এর ন্যায়ারের উপর কাবাগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে বলে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ এই ন্যায়ারের পাথর হেরা পর্বত হতে সংগ্রহ করে এনে দেন এবং উক্ত পাথর দিয়ে ন্যায়ার ঢালাই করেও দেন বলে কথিত আছে। এই ন্যায়ারকে পবিত্র কোরআনে 'আল-কাওয়ায়িদ' বলা হয়েছে। কাওয়ায়িদ অর্থ ভিত। 'জান্নাতের পাথর' হাজরে আসওয়াদ জিব্রাইল আ. এর পথ প্রদর্শনে আনীত হয়।

হজরত ইব্রাহিম আ. কাবাগৃহের দুটি কোণ রেখে ছিলেন। একটি হাজরে আসওয়াদ এবং অপরটি রুকুনে ইয়ামনি। খণ্ড খণ্ড পাথরগুলোকে তিনি দেয়ালে বসিয়ে দিতেন। কেটে-ছেঁটে ফেলার কোনো প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। ফলতঃ কোণগুলি গোলাকার, অর্ধবৃত্তাকার দেখাতো। হাজরে আসওয়াদকে কাঁটাগাছের ডালা দিয়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো। কপাটবিহিন দরজা মাটির সমতলে ছিলো। দেয়াল উচ্চতায় নয় হাত ছিলো। কিন্তু ইতিহাসবৃত্তান্তে এটাকে ভুল বলা হয়েছে। আবার সহীহ্ বোখারীর রেওয়াতে কাবার দুটি দরজা ছিলো-বর্ণিত আছে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, চুন-সুরকি দিয়ে দেয়ালের গাঁথুনি হয়নি কেন?

দু'টি দরজাই বা কেনো রাখা হলো? কেনোই বা গোলাকার করা হলো হাজরে আসওয়াদ? সেটা কাঁটা দিয়ে ঘিরে রাখার কারণ কি?

ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা তাহের কুর্দী বলেন যে, হজরত ইব্রাহিম আ. এর যামানায় চুন-সুরকির প্রচলন ছিলো না। পিতা-পুত্রের নির্মাণের কারিগরী কুশলতা–যেটুকু ছিলো তাই ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। সাহায্যকারী হিসাবে ছিলো জুরহাম গোত্রের কিছু অদক্ষ লোক।

বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজ যখন শেষ হলো, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইব্রাহিম আ.কে বললেন, 'এটাই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহিমীর জন্য 'কিবলা', এবং আমার সমীপে নত হওয়ার প্রতীক। অতএব এটাকে তাওহীদের কেন্দ্রভূমি করা গেলো।'

তখন ইব্রাহিম আ. ও ইসমাইল আ. প্রার্থনা করলেন– 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে ও আমাদের সন্তান-সন্ততিকে সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের

তওফিক দান করুন এবং এরই উপর সুদৃঢ় রাখুন..... তাদের জন্য ফলমূল ও খাদ্যশস্যে বরকত দিন এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে বসবাসকারী হেদায়েতপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে এইদিকে আকৃষ্ট করুন যেনো তারা দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসে হজ্জব্রত পালন করে এবং হেদায়েত ও মঙ্গলের এই কেন্দ্রে সমবেত হয়ে নিজেদের জীবনকে পুণ্যময় ও মঙ্গলময় করে তোলে..... ।'

বায়তুল্লাহ নির্মাণের পর হজরত ইব্রাহিম আ. ও ইসমাইল আ. এর প্রার্থনা সালাত কায়েম ও হজ্জব্রত পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং বায়তুল্লাহকে তাওহীদের কেন্দ্ররূপে ঘোষণা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিভিন্ন ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা এই পবিত্র গৃহের খাদেম ও শাসন সংরক্ষক নির্বাচিত করে দেন হজরত ইব্রাহিম আ.কে।

সুরা হজ্জ–এ অন্য ঘোষণা এলো....."আমার সহিত কোনো বিষয়কে অংশী করিও না এবং প্রদক্ষিণকারীগণের জন্য এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণের জন্য, রুকু ও সিজদাকারীগণের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও।"

এই আয়াতের মর্মার্থ এই যে, প্রাক ইসলাম যুগে কোরাইশগণ কাবাগৃহে তওয়াফ করেও কাফির ও মুশরিক ছিলো। কারণ বিশ্বাসগতভাবে তারা তখনো অংশীবাদীত্বে বিশ্বাসী ছিলো। তারা প্রতিমা পূজা ছাড়তে পারেনি। রুজী-রোজগারের, ভাগ্যের ভাল-মন্দের কর্তা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে তারা বিশ্বাসও করতো।

অথচ আল্লাহ্ বলেন, 'মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তা তো বাক্কায় (মক্কায়), উহা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী।' এবং এটাই বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ঘর।

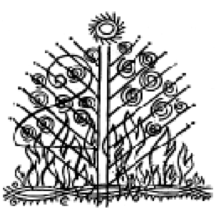

উনিশ

পবিত্রভূমি মক্কায় এখন কত শত মানুষের আনাগোনা। দিগন্তলীন উটের কাফেলা। বিচিত্র মানুষের বিচিত্র জীবনাচরণ। কিন্তু এরই মাঝ থেকে মহান এক প্রিয়জন হারিয়ে গেলেন। বিবি হাজেরা ইন্তেকাল করলেন। অবশ্য ঘটনাটি ঘটেছিলো কা'বা প্রতিষ্ঠার পরে। এর পরের ঘটনা–

হজরত ইব্রাহিম কেনানে ছিলেন এক সময়।

তিনি ফিরে এলেন মক্কায়।

সুদূরের তৃষ্ণায় তিনি তো এক স্থানে স্থির থাকতে পারেন না। এত ব্যস্ততা, অজানার পথে অনির্দিষ্ট যাত্রা, আবার একান্ত ফিরে–আসা আপনজনদের মাঝে, এই তো নবী জীবন।

সহসা একদা সেই জ্যোর্তিময় ঐশী পুরুষটি উপস্থিত হলেন। এসেই বললেন–' হে আল্লাহ্‌র খলীল! কা'বা গৃহকে সাতবার তওয়াফ করুন'।

–কিভাবে–? বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন রাখলেন তিনি।

পদ্ধতিটি শিখিয়ে দিলেন হজরত জিব্রিল আ. আমীন।

তখন হজরত ইব্রাহিম আ. পুত্র ইসমাইল আ. সহ সাতাবার তওয়াফ করলেন। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন।

হজরত জিব্রিল আমীন অতঃপর পিতা ও পুত্রকে হজ্বের অন্যান্য আহকাম পালনের নিয়ম-নীতিগুলি এবং নির্ধারিত স্থানগুলি অর্থাৎ সাফা, মারওয়া, মিনা, মুযদালিফা, ময়দানে আরাফাত, ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিতি দিলেন।

ময়দানে আরাফাতে পৌঁছে হজরত জিব্রিল আমীন নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি কি হজ্জ্বব্রত পালনের আহকামগুলির সত্যিকার পরিচয় পেলেন?

–হ্যাঁ পেলাম।

–উত্তর। জিব্রিল আমীন অন্তর্হিত হলেন অতঃপর।

এরপরই আল্লাহ্‌র অন্যরকম প্রত্যাদেশ হলো– 'এই আওয়াজকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিন'....।

হজরত ইব্রাহিম আ. সবিনয় আরজ করলেন, হে পরওয়ারদিগার! আমার আওয়াজ কিভাবে দূর–দূরান্তে পৌঁছাবে?

"আপনি আওয়াজ তুলুন, পৌঁছে দেবার কাজ আমার–।"

আল্লাহ্‌তায়ালা আশ্বস্ত করলেন তাঁকে।

রাযী বর্ণনা করেছেন– 'হজরত ইব্রাহিম আ. 'মাকামে ইব্রাহিম' পাথরটির উপর দণ্ডায়মান হলেন। তখন উপরে উঠতে থাকলো পাথরটি। পাহাড়ের চেয়েও উঁচু হয়ে গেলো পাথরটি।

পাহাড়, পর্বতমালা, নদী, সমুদ্র, সমতলভূমি যেনো সমগ্র এক মহাপৃথিবী; আদি হতে অন্ত পর্যন্ত মুহূর্তে সংস্কুচিত হয়ে এলো। সেখানে ইনসান ও জ্বীনজাতি সমবেতও হলো।

তিনি সুউচ্চস্বরে আহবান জানালেন– "হে মানব সমাজ! তোমাদের জন্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। তোমরা, তোমাদের পরওয়ারদিগারের দাওয়াত কবুল করে নাও"।

পূর্ব–পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে সমগ্র মানবকুল এই দাওয়াতের জবাবে সমস্বরে উচ্চারণ করলো– লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা।

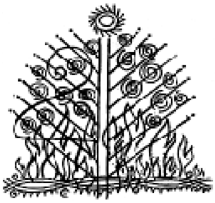

বিশ

বস্তুর হাকীকত বা রহস্য অনুসন্ধানের প্রতি হজরত ইব্রাহিমের প্রবলতম ঝোঁক ছিলো। এবং তা স্বভাবগতভাবেই ছিলো।

যদিও জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, তবু আল্লাহ্তায়ালার কুদরতী হাকীকত সম্বন্ধে বাস্তব উপলব্ধির আকাংখা তিনি সম্বরণ করতে পারেননি। এও যেনো আশেক-মাশুকের রহস্যময় এক লীলা।

একদা হজরত ইব্রাহিম আ. আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন– হে মহান প্রভু! পুনরুত্থান কিভাবে হবে?

"আপনি কি এ সম্বন্ধে সন্দিহান?" পাল্টা প্রশ্ন করলেন আল্লাহ্তায়ালা।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন তিনি, কখনো তা নয়। হে আমার প্রতিপালক– আমার এই জানার আগ্রহ, আমার বিশ্বাসের বিরোধী নয়? শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য, যা আমাকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের অবস্থানটি চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে দেবে।

তখন আল্লাহ্তায়ালা বললেন, বেশ। কয়েকটি পাখি আনুন এবং পাখিগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে সম্মুখের পাহাড়ের উপর ছুঁড়ে মারুন। অতঃপর দূর থেকে একে একে সেগুলোকে আহবান করুন।

হজরত ইব্রাহিম আ. তাই করলেন। এবং তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলেন– ভিন্ন জাতের পাখিকে যখন তিনি পৃথক পৃথকভাবে আহবান করলেন, তখন বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো একত্রিত হয়ে নিজ নিজ রূপ ধারণ করে জীবন্ত হয়ে তাঁর দিকে উড়ে এলো।

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছেঃ

"যখন ইব্রাহিম বললেন, হে আমার প্রতি পালক! কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। তিনি বললেন, তবে কি আপনি বিশ্বাস করেননি? ইব্রাহিম বললেন, কেনো করবো না, তবে এটা কেবল আমার চিত্তপ্রশান্তির জন্য।

তিনি বললেন, তবে চারিটি পাখী নিন এবং ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে পাহাড়ের উপর ওদের এক একটি অংশ ছুঁড়ে মারুন। তারপর তাদেরকে আহবান করুন, ওরা দ্রুতগতিতে আপনার দিকে ছুটে আসবে। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

বিষয়টি বিস্ময়কর হলেও অকাট্য সত্য। এবং জ্ঞানীদের জন্যে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

ইসলাম একটি মহাসত্যের নাম।

ইসলামের মূলে রয়েছে অনন্ত প্রেমের পাথার।

ইসলাম শব্দের অর্থ সমর্পণ, প্রীতি ও শান্তি। আর, হজরত ইব্রাহিম আ. ছিলেন পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী, পূর্ণ প্রেমিক মুসলমান।

"ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন"– অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন– "আমিই প্রথম মুসলমানদের দলভুক্ত।"

যখন তিনিই প্রথম মুসলমান; অতঃপর তিনিই বিশ্বমানবের প্রথম নেতা হিসেবেও প্রেরিত।

আল্লাহ্তায়ালা নিজে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিচ্ছেন– "ইন্নী যায়িলুকা লিন নাছি ইমামা" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে মানব জাতির জন্যে নেতা নির্বাচিত করে দিলাম।"

উল্লিখিত আয়াতে কারীমার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইব্রাহিম আ. এর প্রবর্তিত দ্বীনই মানবজাতির একমাত্র পালনীয় দ্বীন।

এই প্রেক্ষিতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ স. এর উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন "আমার এই ধর্ম, হজরত ইব্রাহিম আ. এরই প্রবর্তিত ধর্ম।" অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম আ. এর ধর্মই ইসলাম। এই ইসলাম ধর্মকেই বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ স. পুনঃ প্রবর্তিত করেন।

ফলতঃ শুধুমাত্র এ কারণেই প্রত্যেকবার নামাজে তাশাহুদ পাঠান্তে দরূদ শরীফ পাঠ করে বিশ্বনবী হজরত নবীয়ে করিম স. এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করার সাথে সাথে হজরত ইব্রাহিম আ. এর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা হয়ে থাকে।

হজরত ইব্রাহিম আ. তৌহিদ প্রচার ও প্রসারের চূড়ান্ত প্রচেষ্টাই শুধু করেননি, আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাঁর বংশধরের মধ্য থেকে একটি সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধ মুসলমান হওয়ার বা অনুগত বান্দা হওয়ার আরজও করেছিলেন। যেমনঃ "ওয়ামিন জুররিয়াতিনা উম্মাতাম মোসলিমাতাললাকা।"

সুতরাং তিনি ছিলেন মিল্লাতে হানীফের আহবায়ক। স্বীয় পুত্রদের প্রতি তাঁর আদেশ ছিলো এইরূপঃ

"আমার পুত্রগণ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে এই ধর্মকে পছন্দ করেছেন, অতএব যে পর্যন্ত তোমরা মুসলমান না হও, সে পর্যন্ত মরো না।"

যেহেতু পবিত্র কোরআনের পথ–প্রদর্শনের পয়গাম মূলতঃ মিল্লাতে ইব্রাহিমেরই পয়গাম; অতএব তিনি ছিলেন মুসলমান জাতির প্রথম হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনকারী।

অথচ বক্রদৃষ্টিসম্পন্ন স্প্রেংগার, সানোক, ওয়েনসিংক বা তাদের অনুসারীদের মিথ্যে প্রচারণা ছিলো নিতান্ত অসার, ভিত্তিহীন, বিদ্বেষপ্রসূত। হজরত ইব্রাহিম আ.কে তারা ইয়াহুদী বলে দলে টানতে চেয়েছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা এসবকিছুকে খণ্ডন করে ঘোষণা দিচ্ছেন– "ইব্রাহিম ইয়াহুদী ছিলেন না, খৃষ্টান ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ও আত্মসমর্পণকারী।" বলা হয়েছে, যিনি নিজেকে চিনেছেন, তিনিই রবকে চিনেছেন। যিনি যতটা প্রবৃত্তিকে প্রশান্ত করতে পেরেছেন, তিনিই ততটা শুদ্ধতম মুসলমান হতে পেরেছেন। এই নিজেকে চেনার, স্বীয় রবকে চেনার জানার উদগ্র আগ্রহ, কৌতুহল, শিশু বয়েস থেকেই তাঁর ছিলো। একদা হীরা পর্বতের গিরিগুহায় বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ স. জ্যোতির্ময় ঐশী পুরুষ জিব্রিল আমীনের আলিঙ্গনে যে আলোক প্রস্রবণ বক্ষে ধারণ করেছিলেন, যাতে হৃদয় তাঁর প্রসারিত হয়েছিলো। মুহূর্তের মধ্যে অন্য মানুষে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। সেই আলোক স্তম্ভ হজরত ইব্রাহিম আ. এর বক্ষের মধ্যেও নিহিত ছিলো। জীবনের সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তরালে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে তিনি সেই অবশ্যম্ভাবী আলোকশক্তিটির নিঃশব্দ পদচারণা উপলব্ধি করেছিলেন স্পষ্টভাবে।

যাহোক প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইব্রাহিম আ. এর অন্যতম পুত্র ছিলেন হজরত ইসহাক আ. তদীয় পুত্র হজরত ইয়াকুব আ.। তাঁর বংশধরগণ দুনিয়ায় বনী ইসরাইল নামে পরিচিত। এরাই বর্তমানে ইয়াহুদী জাতি। আল্লাহ্তায়ালা এদেরকে বহু প্রকার নিয়ামত দান করা সত্ত্বেও অতি সামান্যসংখ্যক মানুষ ব্যতীত অধিকাংশ বনি ইসরাইল আল্লাহ্র সাথে শিরক কুফরীতে লিপ্ত ছিলো।

অথচ এই বংশেই জন্মলাভ হয়েছিলো হজরত ইউসুফ আ. এর ন্যায় মহানবীর। তৎপরবর্তী হজরত মুসা আ., হজরত আইয়ুব আ., হজরত জাকারিয়া আ., হজরত ইয়াহইয়া আ., হজরত ঈসা আ. প্রমুখ নবীগণ। এবং তাঁরা সবাই হজরত ইব্রাহিম আ. এর প্রবর্তিত দ্বীনকেই প্রচার করেছিলেন।

অপরদিকে হজরত ইসমাইল আ. এর বংশধরগণ ছিলেন বনী ইসমাইল নামে মশহুর। পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনকে হজরত ইসমাইল আ. প্রচার ও প্রসার করেছিলেন আমৃত্যু।

কিন্তু কালক্রমে এই বংশেও পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটলো এবং পরবর্তী কালে এই বনী ইসমাইল বংশেই বিশ্ব নবী হজরত মোহা্ম্মদ মোস্তফা স. এর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব ঘটে।

মূলতঃ বিশ্ব নবী স. ছিলেন স্পর্শমনিতুল্য নবী ও রসুল। পৌত্তলিক জাতিকে সত্য পথ প্রদর্শনের পূর্বে তিনি নিজে হজরত ইব্রাহিম আ. এর দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। কারণ একদা তাঁর উপর প্রত্যাদেশও হলো– "এখন আমি আপনার প্রতি এই প্রত্যাদেশ করলাম, আপনি একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করুন; ইব্রাহিম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

অন্যত্র বলা হয়েছে– "আমি তো এর পূর্বে ইব্রাহিমকে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তাঁর সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত"। অর্থাৎ শিশু বয়েস থেকেই হজরত ইব্রাহিম আ. ছিলেন প্রেমিক নবী, দূরদর্শী এবং জ্ঞানী। তিনি ছিলেন সুন্নতে খাৎনার প্রবর্তনকারী।

তিনি ছিলেন কা'বার ভিত্তি স্থাপনকারী। তিনিই ছিলেন পুণ্যময় হজ্জ্ব ও কোরবানীর প্রবর্তনকারী। তিনি ছিলেন– মুসলমান জাতির পিতা।

স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালাও এতদ সম্বন্ধে বজ্র নির্ঘোষ ঘোষণা দিলেন– "মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিমা হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন।" হে রসুল! আপনি পিতা ইব্রাহিমের ধর্মনীতি অনুসরণ করুন। তিনিই বিশ্বাসীগণকে মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন।

হ্যাঁ, তাই। সত্যি আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম আ. তিনি আমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান।

ISBN 984-70240-0040-8

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া